জবরদখল

অষ্টম সংখ্যা, ১৭ই নভেম্বর ২০১৪

২ টাকা

“এক ধাক্কা অউর দো”

দক্ষিণবঙ্গের ট্যাক্সি চালকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের রিপোর্ট

অরিত্র বসু, ঐশ্বর্য্য বিশ্বাস, রাজদেব ব্যানার্জী, শুভাশিষ দাস

গত ১১ই আগস্ট থেকে লাগাতার ৫ দিন ব্যাপী কলকাতার রাজপথে ট্যাক্সি-চালকদের যে বিরাট সরকার-বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত করতে দেখা গেল, এদেশের পরিবহন শ্রমিকদের সংগঠিত আন্দোলনের ইতিহাসে তা উল্লেখযোগ্যতার দাবী রাখে। এই অনড় লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে শুরু এই শহর বা রাজ্যই নয়, এমনকি গোটা দেশের মালিকশ্রেণীর সামনে, এক প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন এই শহরের ট্যাক্সি-চালকেরা। এই আন্দোলন নিঃসন্দেহে আমাদের সামনে এক নতুন সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলেছে এবং তা বিশেষত এ জন্যই যে সমসাময়িক অন্যান্য পরিবহন ধর্মঘট বা আন্দোলনের নিরিখে এই লড়াইয়ের গুরুত্ব অনেকটাই আলাদা। কেন?

গোটা মালিকশ্রেণী ও তার সরকার, আইনি-বেআইনি সমস্ত উপায়ে যখন সারা দেশের সমস্ত শ্রমিক-কৃষক-মেহনতীদের আন্দোলনগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করার পরিকল্পনা করছে, সেখানে দাঁড়িয়ে দেশের অন্যতম ব্যস্ত শহর কলকাতার বুকে টানা পাঁচদিন ধরে ট্যাক্সি-চালকদের ঐক্যবদ্ধ লড়াই শ্রমজীবী মানুষদের মনে এক বিরাট আশা জাগিয়ে তুলেছে। এই ঐক্যবদ্ধতাই আজ গোটা দেশের শোষিত-বঞ্চিত শ্রমজীবীদের কাছে এক নতুন সম্ভাবনার বিকাশ ঘটিয়েছে। ভাতের থালায় লাথি পড়লে, খাওয়া বন্ধ করে নয়, বরং একজোট হওয়া শক্তি দিয়ে লাথি মারা পা-টাকেই যে ভেঙ্গে দিতে হয়, আগস্ট মাসের এই লড়াই দিয়ে সেই বার্তাই দিয়েছেন শহরের ট্যাক্সি-চালক ভাইয়েরা। এই প্রবন্ধে আমরা সেটাই দেখাব যা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে, শহরের বিভিন্ন প্রান্তের ট্যাক্সি-চালকদের সাথে কথা বলে আমরা সঞ্চয় করেছি, এবং শুধুমাত্র সেখানেই থেমে না থেকে, আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব ওই সত্যগুলোকেও, যা এই ব্যবস্থার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যমাত্র। এবং

এর পর সপ্তম পৃষ্ঠায়

ভারতের কৃষি উৎপাদনের চরিত্র—সামন্ততান্ত্রিক না পুঁজিবাদী

ঋক চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ এক আধা পুঁজিবাদী, আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশ—অর্থাৎ এদেশের জাতীয় অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ আজও আধুনিক পুঁজিপতি ও পুরনো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করা জমিদারদের মিলিজুলি শক্তির হাতে—এই বিশ্লেষণ আজ কতটা প্রাসঙ্গিক, ভেবে দেখা দরকার আছে। কোন অর্থনৈতিক পণ্ডিতের মত আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজবো না। বরং এ প্রশ্ন আজ আমাদের মত কেজো মার্ক্সবাদীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের কাজ এই উৎপাদনী ব্যবস্থায় বদল আনা—উৎপাদন প্রক্রিয়ার নেতৃত্বে সর্বহারা শ্রেণীকে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াই চালানো। কাজেই যে দেশে ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থায় নিযুক্ত এবং যখন গ্রামীণ উৎপাদনের সিংহভাগ আসে কৃষিক্ষেত্র থেকে তখন এদেশের কৃষি উৎপাদনের চরিত্র জানা জরুরী এবং সেখানে যে দ্বন্দ্বগুলি কাজ করছে তাদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। কৃষি উৎপাদনে নিযুক্ত পরস্পর বিবাদমান অংশের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে তবেই আমরা সমাজ বদলের লড়াইতে কাদের পাশে পাব গ্রামীণ সমাজে এবং কারাই বা আগামী দিনে গ্রামীণ শ্রমজীবী অংশের নেতৃত্ব দেবে তা বুঝতে পারব। কাজেই এ প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক যে আজ ভারতে কৃষি উৎপাদনের চরিত্র সামন্ততান্ত্রিক না পুঁজিবাদী? সঠিক বিশ্লেষণই আমাদের সাহায্য করবে আগামী দিনের বন্ধু খোঁজার কাজে।

প্রথমে সংক্ষেপে কৃষি উৎপাদনে পুঁজির বিকাশের ধারাটি চিনে নেওয়া যাক্। তারপর আমরা তথ্যকে বিশ্লেষণ করে দেখব যে আদৌ এদেশের কৃষি উৎপাদনের চরিত্রটি কিরকম।

❐ কৃষি উৎপাদন সম্পর্কিত চালু ধারনা

সাধারণভাবে আমাদের মধ্যে এক ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করে কৃষি উৎপাদনের শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণে। আমরা উপরিস্থিত অনেকগুলো ছোট ছোট বৈশিষ্ট্য দিয়ে শ্রেণী চরিত্রকে বোঝার চেষ্টা করি, কিন্তু কখনই এটা মাথায় রাখিনা যে উৎপাদনের শ্রেণীচরিত্র নির্ধারিত হয় উৎপাদন সম্পর্কের দ্বারা

কৃষি উৎপাদন প্রস্তরযুগের প্রযুক্তিতে চললেও, ক্ষুদ্র ব্যক্তি মালিকানা/ বেনামী জোৎ-এ চললেও তার চরিত্রে পুঁজিবাদী হবে যদি উৎপাদিত ফসলের অধিকাংশটাই বাজারে বিক্রির জন্য আসে। যেইমাত্র কৃষিতে নিযুক্ত শ্রম + মূলধন + উপকরণের একটি বিনিময়মূল্য সমাজে তৈরী হবে তখনই

এর পর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়

পুনর্মুদ্রণ

সমাজতন্ত্রের দিকে এগোতে ভয় পেলে আগুবাড়া যায় কি?

ভি. আই. লেনিন

...(কোন-না-কোন আকারে) সাধারণত বুর্জোয়া, স্যোশালিস্ট-রেভলিউশানারি এবং মেনশেভিক পত্র-পত্রিকাগুলিতে উত্থাপিত এই চলতি আপত্তিটা হল অনগ্রসর পুঁজিতন্ত্রের পক্ষসমর্থন, স্ত্রুভীয় সাজে সজ্জিত সমর্থন। এতে যেন বলা হয়, আমরা সমাজতন্ত্রের জন্যে পরিণত নই, সমাজতন্ত্র ‘প্রবর্তনে’র সময় আসে নি, আমাদের বিপ্লবটা বুর্জোয়া বিপ্লব, বুর্জোয়াদের প্রতি হীনানুগত্য স্বীকার করতে হবে আমাদের (যদিও ১২৫ বছর আগে ফ্রান্সে বুর্জোয়া মহাবিপ্লবীরা তাঁদে বিপ্লবটিকে মহাবিপ্লব করে তুলেছিলেন ভূস্বামী হোক, পুঁজিপতি হোক সমস্ত উৎপীড়কের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস খাটিয়ে!)।

বুর্জোয়াদের ঝুটা-মার্কসবাদী নোকরেরা, যাদের সঙ্গে জুটেছে সোশালিস্ট-রেভলিউশানারিরা এবং যারা ঐভাবে তর্ক তোলে, তারা জানে না (তাদের মতের তাত্ত্বিক ভিত্তি পরীক্ষা করলে যা দেখা যায়) সাম্রাজ্যবাদ কী, পুঁজিতান্ত্রিক একচেটে কী, রাষ্ট্র কী, আর কীই-বা বৈপ্লবিক গণতন্ত্র। কেননা সেটা যেকেউ বোঝে সে মানতে বাধ্য যে, সমাজতন্ত্রের দিকে ছাড়া কোন অগ্রগতি হতে পারে না।

সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে প্রত্যেকে কথা বলে। কিন্তু সাম্রজ্যবাদ হল স্রেফ একচেটে পুঁজিতন্ত্র।

রাশিয়ায়ও পুঁজিতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে একচেটে পুঁজিতন্ত্র, সেটা সাব্যস্ত করতে ‘প্রোদুগোল’, ‘প্রোদামেৎ’, চিনি সিন্ডিকেট, ইত্যাদির দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। একচেটে পুঁজিতন্ত্র কিভাবে রাষ্ট্রীয়-একচেটে পুঁজিতন্ত্রে পরিণত হয় সেটা চাক্ষুষ হয় চিনি সিন্ডিকেট থেকে।

রাষ্ট্রটা কী? রাষ্ট্র হল শাসক শ্রেণীর একটা সংগঠন—যেমন জার্মানিতে য়ুঙ্কার আর পুঁজিপতিদের। তাই, জার্মান প্লেখানভরা (শাইডেমান, লেঞ্চ এবং অন্যান্যোরা) যেটাকে বলেন ‘যুদ্ধকালীন সমাজতন্ত্র’ সেটা আসলে যুদ্ধকালীন রাষ্ট্রীয়-একচেটে পুঁজিতন্ত্র

এর পর তৃতীয় পৃষ্ঠায়

কম: পি. সুন্দারাইয়া-র ইস্তফাপত্রের নির্বাচিত অংশ

[সম্পাদকের পক্ষ থেকে : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)-র প্রথম সাধারণ সম্পাদক কম: পি. সুন্দারাইয়া তাঁর সম্পাদ পদ ও পলিটব্যুরো থেকে ইস্তফার কারণগুলি ব্যাখ্যা করে যে পত্র লিখেছিলেন, তার অধিকাংশ বিষয়বস্তুই আজ প্রায় চল্লিশ বছর পর এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে যে মূলগত ও ব্যাপক সমস্যাগুলি দেখা দিয়েছে, তার সাপেক্ষে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এক স্বৈরতান্ত্রিক বৃহৎ বুর্জোয়া দলকে রুখতে অন্য প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের সাথে যুক্ত সংগ্রামের কৌশলগত লাইন প্রসঙ্গে এই ইস্তফাপত্রে তিনি যে মত রেখেছিলেন, তা আমরা এখানে প্রকাশ করলাম।]

জনসঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রাম ও যুক্ত কমিটি

কম: পি. সুন্দারাইয়া

কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব, “জরুরী অবস্থার ঘোষণা ও পরবর্ত্তী পরিস্থিতি”—যা পলিটব্যুরো কর্ত্তৃক চূড়ান্ত রূপদানের পর ২/৯/১৯৭৫ তারিখে প্রকাশিত হয়, বলা হয় তলা থেকে যুক্ত মোর্চা গঠনের সবচেয়ে বড় সুযোগ উপস্থিত হয়েছে—অর্থাৎ সমস্ত বিরোধী পার্টির অনুগামী জনগণ এমনকি কংগ্রেসের অনুগামীদের নিয়ে যুক্ত মোর্চা যা জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠবে এবং সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরায় অর্জন করবে। তারপর বলা হচ্ছে, “নীচু থেকে এমন একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করেছে যে, নাগরিক অধিকারের জন্য সংগ্রামে আমাদের পার্টি, সকল পার্টি,

এর পর পঞ্চম পৃষ্ঠায়

ভারতের কৃষি উৎপাদনের চরিত্র—সামন্ততান্ত্রিক না পুঁজিবাদী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সেই উৎপাদন পুঁজিবাদী চরিত্র নিতে বাধ্য। মুখ্য বিষয় হল উৎপাদনের উদ্দেশ্য বিক্রি কিনা, অর্থাৎ উৎপাদিত দ্রব্য পণ্যে পরিণত হয় কিনা। কাজেই আজ যদি কৃষি উৎপাদনগুলি পণ্যে পরিণত হয় তবে সেই কৃষি উৎপাদন তার সমস্ত বৈচিত্র্য সমেতই একটি পুঁজিবাদী উৎপাদনেই পর্যবসিত হবে। ভারতবর্ষে কৃষিক্ষেত্রে মোটের উপর চারটি বিষয়ে আঞ্চলিক বৈচিত্র দেখা যায় যায়

১. জমি মালিকানার প্রশ্নে

২. কৃষি উৎপাদনের পদ্ধতির প্রশ্নে

৩. কৃষিকে বড় বড় সংস্থার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে

৪. কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমশক্তির মধ্যে লিঙ্গগত, জাতপাত বা ধর্মীয় বিভাজনের প্রশ্নে

আমাদের মূল যুক্তি হল—এই বৈশিষ্ট্যগুলির তারতম্য থাকতেই পারে, কিন্তু দেখতে হবে প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের উদ্দেশ্য কি হচ্ছে—পণ্য উৎপাদন কি না? আর তার থেকেই উৎপাদনের শ্রেণীচরিত্র বোঝা যাবে এবং এই আঞ্চলিক সমস্যার সমাধানের প্রশ্নে বামপন্থীদের কৌশল সেই শ্রেণীচরিত্রকে মাথায় রেখেই তৈরি হবে।

❐ জমির মালিকানা এবং উৎপাদনের পদ্ধতি

আমাদের দেশে কৃষিসুমারীতে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী সাধারণভাবে জমিতে কৃষি উৎপাদনের চারটি ভিন্ন পদ্ধতিকে চিহ্নিত করা যায়—

১. নিজের জমিতে নিজে উৎপাদন

২. জমিতে মালিকের আংশিক উৎপাদন এবং আংশিক লিজ্-এ উৎপাদন এবং আংশিক ভাড়াটে শ্রমশক্তি দ্বারা উৎপাদন

৩. জমিতে পুরো উৎপাদনই লিজে

৪. নিজের জমিতে শ্রমশক্তি ভাড়া করে উৎপাদন

পুঁজি এই ধরনের উৎপাদনী ব্যবস্থায় কিভাবে ভূমিকা পালন করে? নিজের জমিতে নিজে উৎপাদন বা ভাড়াটে শ্রমশক্তি দ্বারা উৎপাদন অত্যন্ত পরিচিত পদ্ধতি। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে জোত চলত তাকে উৎখাত করেই এই উৎপাদনী ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। চাষী নিজের জমি পেয়েছে বা অন্যের জমিতে মজুরীর বিনিময়ে উৎপাদনে স্বীকৃত হয়েছে। বস্তুত এই পদ্ধতি পুঁজিবাদী উৎপাদনেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। আজকে শহরে শিল্পে নিযুক্ত ভাড়াটে শ্রমিক বা স্বনির্ভর শ্রমিকের সাথে এদের তফাত খুবই কম। চাষী এখন নিজের জমিতে উৎপাদন করে সেই ফসল বাজারজাত করবার জন্যই। পুরনো ব্যবস্থার মত চাষের উৎপাদন সে নিজের জন্য রেখে উদ্বৃত্তটা বিক্রি করেনা। বরঞ্চ তার গোটা শ্রমটাই বাজারে বিক্রি হয় এবং নিজের শ্রমে উৎপাদিত মূল্যের একটা অংশই আবার ফেরত পায়। আর ক্ষেতমজুর তো সরাসরি জমিতে পুঁজিবাদী সম্পর্কেই আবদ্ধ। তার শ্রমে উৎপাদিত মূল্যের থেকেই সে তার মজুরী ফেরৎ পায়।

এর বাইরে পড়ে থাকে নিজের জমি ভাড়া দিয়ে উৎপাদন করানো, অর্থাৎ লিজ নিয়ে উৎপাদন। এই উৎপাদনের চরিত্রটি কি—পুঁজিবাদী না পুরনো সামন্ততান্ত্রিক। মার্ক্স তাঁর পুঁজি গ্রন্থে পরিষ্কার দেখিয়েছেন যে এমন উৎপাদন সম্পর্ক পুঁজিবাদী উৎপাদনেই সম্ভব—একে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন ত্রিযোজী সূত্রে। এখানে তিনি পরিস্কার করেছিলেন যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিল্প উৎপাদনে সরাসরি শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক কৃষি উৎপাদনে পাল্টে দাঁড়ায় জমির মালিক-কৃষি উৎপাদনের উপকরণের মালিক—কৃষি উৎপাদক/কৃষিশ্রমিক। এর খানিকটা মিল পাওয়া সম্ভব শিল্প উৎপাদনের উৎপাদনের মালিক অর্থাৎ শিল্প-মালিক—মহাজনী পুঁজিপতি (যে মালিককে পুঁজির যোগান দেয় সুদের বদলে)—শিল্পশ্রমিক যদিও তার পার্থক্য হল এই যে মহাজনী পুঁজিপতির টাকা খাটে উৎপাদনে, কিন্তু জমির মালিক ব্যয় করে না কিছুই। কৃষি উৎপাদনে জমির মালিক যখন নিজে জমি দেয় তখন লিজ বাবদ সে উৎপাদনের একটা অংশই দাবী করে। এই অংশটি আসে উদ্বৃত্ত কৃষি উৎপাদন থেকেই। জমির ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কখনো কখনো লিজে চাষ করার সময় উৎপাদক এবং উৎপাদনের বিনিয়োগকারী একজনই হয়। কিন্তু তাহলেও উৎপাদনের পুঁজিবাদী চরিত্র পাল্টায় না।

ফলে মোটের উপর বোঝা যাচ্ছে কৃষি উৎপাদনী ব্যবস্থার সমস্ত স্তরেই পুঁজিবাদী উৎপাদনী ব্যবস্থা চালু থাকা সম্ভব এবং কৃষি অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হিসাবে পুঁজির প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই উৎপাদনী চক্রেই সম্ভব।

❐ পুরনো সামন্তপ্রভুদের আজকের অবস্থা

গোটা দেশে ভূমিসংস্কার কথাটি পরিচিত হওয়ার পর আজকে সরাসরি গায়ের জোরে বেগার খাটানো বা জোত্ চাষ করানো মুশকিল। একথাও আমরা অস্বীকার করিনা দেশে বহু জায়গাতেই বেনামে বিরাট জমি পুরনো জমিদার পরিবারগুলির হাতে থেকে গেছে। বহু ক্ষেত্রে তারা অঞ্চলের ৭০% জমির মালিক। উৎপাদনের হাতিয়ার থেকে শুরু করে মজুত এবং অন্যান্য বিক্রি করার সংস্থাগুলির মালিকানা তারাই ভোগ করে। কিন্তু তার মানেই কি তাদের জমিতে উৎপাদন সম্পর্ক পুরনো সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কে বাঁধা পড়ে আছে। না, বরং উল্টোটাই। এসব ক্ষেত্রে কৃষিতে পুঁজির প্রবেশ ঘটেছে ব্যক্তি পুঁজিপতির হাত ধরে। এই পুরনো জমিদাররাও তার জমিতে মজুরীর বিনিময়ে উৎপাদন করায়, এবং এই উৎপাদনকে বিপুল পণ্যে পরিণত করে। উৎপাদন বাজারে বেচে যে মুনাফা সে করে তার একটা বড় অংশ সে তার অন্য ব্যবসাগুলিতে বিনিয়োগ করে। ফলে তার ঐতিহাসিক পরিচয়ে সে পুরনো জমিদার হতে পারে কিন্তু অর্থনীতিতে তার ভূমিকা ব্যক্তি পুঁজিপতির ভূমিকাই—যার উৎপাদন করানোর একমাত্র লক্ষ্য হল মুনাফা সৃষ্টি।

❐ পুঁজিবাদী কৃষি উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য

সাধারণভাবে জমিভিত্তিক অর্থনীতির চরিত্রটা একটু জটিল। প্রথমতঃ এখানে সরাসরি মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়না। এছাড়া কৃষি উৎপাদকের বিচিত্র জটিল বিন্যাস এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা অর্থনৈতিক উপাদানগুলিকে ঘোলাটে করে রাখে। কৃষি অর্থনীতিতে পুঁজির চলন তাই কিভাবে ঘটে আমরা সেটা সংক্ষেপে বোঝার চেষ্টা করব।

জমিভিত্তিক অর্থনীতিতে তিনধরনের মালিক—১. জমির মালিক ২. উৎপাদনের মালিক ৩. শ্রমের মালিক—কৃষিশ্রমিক। জমির মালিক কখনো নিজেই কৃষি উৎপাদনের বিনিয়োগ করে আবার কখনো সে অন্য বিনিয়োগকারীকে জমি ভাড়া দেয়। উভয়ক্ষেত্রেই উৎপাদনের মালিক সে। যখন সে জমিতে সরাসরি পুঁজি বিনিয়োগ করছে তখন তাকে মাথায় রাখতে হয় কৃষিউৎপাদন থেকে তার নিযুক্ত পুঁজি + মুনাফাকে ফেরৎ আনা। কাজেই সে বাধ্য হয়েই উৎপাদিত কৃষি ফসলকে বাজারের পণ্যে পরিণত করে। সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় নিজের ভোগের জন্য উৎপাদন—আর সম্ভব হয় না। যখন জমির মালিক জমি ভাড়া দেয়, তখনও সে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মতই উদ্বৃত্ত উৎপাদন করাতে বাধ্য করে। বস্তুত যখন চুক্তিতে জমির মালিক উৎপাদক বা বিনিয়োগকারীকে ভাড়া দিচ্ছে তখন সে ভাড়া হিসাবে যা দাবী করছে তা হল ঐ জমিতে উৎপাদিত মুল্যেরই একটা অংশ। উৎপাদক বা বিনিয়োগকারী এই বাড়তি মূল্য উৎপাদন করতে/ করাতে বাধ্য হয়। ফলে উৎপাদনের চরিত্র পাল্টে তা পুঁজিবাদী উৎপাদনে পরিণত হয়।

কৃষিক্ষেত্রে পুঁজির চলন আসলে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সহজ দ্বিমুখী সম্পর্ককে অনেকগুলি ভাগে ভেঙে ফেলে। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনে যেখানে ছিল দুটি শ্রেণী—জমির মালিক সামন্তপ্রভু আর কৃষিউৎপাদক অর্থাৎ কৃষক। পুঁজি যেই কৃষিক্ষেত্রে আসতে শুরু করে এবং উৎপাদনী চরিত্রের পরিবর্তন ঘটাতে থাকে তখন এই সহজ দ্বিমুখী সম্পর্ক ভেঙে তৈরী হয় তিনটি শ্রেণী---জমির মালিক, কৃষিতে বিনিয়োগকারী এবং কৃষিউৎপাদক। স্থানীয় ভিত্তিতে কখনো দুটি শ্রেণী একসাথে মিশে থাকে—যেমন একই ব্যক্তি জমির মালিক এবং কৃষিতে বিনিয়োগকারী অথবা একই ব্যক্তি বিনিয়োগকারী এবং উৎপাদক। ছোট জমির ক্ষেত্রে পুঁজি এই তিনটি শ্রেণীকে অনেকসময় একসাথে মিলিয়ে দেয়। কিন্তু সবকটি ক্ষেত্রেই কৃষি উৎপাদনের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় মুনাফা জমির ভাড়ার উৎপাদন। এটাই পুঁজিবাদী কৃষির সার্বজনীন চরিত্র। পুঁজি তার চরিত্র অনুযায়ী কৃষিক্ষেত্রের তিনটি পৃথক শ্রেণীকে শেষপর্যন্ত দুটি বড় ভাগে এনে দাঁড় করায়—১ কৃষিমালিক এবং ২. কৃষি উৎপাদক। ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কৃষিক্ষেত্রের মূল দ্বন্দ্ব এই দুই শিবিরের মধ্যেই দানা বাঁধতে থাকবে।

আমাদের মূল প্রতিপাদ্যটি হল কৃষিতে পুঁজি বিনিয়োগের অবশ্যম্ভাবী ফল জমির কেন্দ্রীভবন—এমনটা নাও ঘটতে পারে। বস্তুত জমি ভিত্তিক অর্থনীতিতে এমনটা না ঘটাই স্বাভাবিক। বরং অজস্র খুচরো উৎপাদকের উপর নির্ভর করেই কৃষিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন টিকে থাকতে পারে। যেহেতু জমির পরিমাণটাই একমাত্র মাপকাঠি নয় উৎপাদনের ফলে অসংখ্য ছোট-মাঝারি উৎপাদকও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকে। এমনকি ছোট পরিমাণ জমিকে কেন্দ্র করেই পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কে চালু থাকে যেমনটা শিল্পক্ষেত্রেও চালু থাকে। বড় সংস্থার হাতে জমির কেন্দ্রীভবন পুঁজির একচেটিয়াতে পরিণত হবার মতই একটা পর্যায়। কিন্তু এই কেন্দ্রীভবন উৎপাদন ক্ষেত্রে অনুপস্থিত মানেই যে কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি তা নয়। আমরা এটাই বলতে চাইছি যে আজ ভারতের কৃষিক্ষেত্রে সিংহভাগ শ্রমই পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কে আবদ্ধ এবং তা ঘটে চলে মাঝারি এবং ক্ষুদ্র পরিমাণ জমিকে ঘিরেই।

আসুন এবার আমরা ভারতের কৃষিক্ষেত্রের কিছু তথ্য থেকে এই প্রবণতাটা ধরার চেষ্টা করি।

❐ ভারতের কৃষি অর্থনীতির প্রয়োজনীয় তথ্য

ভারতবর্ষের গত ১৫ বছরে জমি বন্টনের ছবিটা হল

	প্রান্তিক (০-১ হেক্টর)	ছোট (১-২ হেঃ)	ছোট মাঝারি (২-৪ হেঃ)	মাঝারি (৪-১০ হেঃ)	বড় (১০হেঃ এর উপর)[১]
১৯৯৫-৯৫	১৭.২৯%	১৮.৮%	২৩.৮৫%	২৫.৩৪%	১৪.৭৮%
২০০০-০১	১৮.৭%	২০.১৬%	২৩.৯৬%	২৩.৯৭%	১৩.২১%
২০০৫-০৬	২০.২২%	২০.৯১%	২৩.৯৪%	২৩.১১%	১১.৮২%
২০১০-১১	২২.২৫%	২২.০৭%	২৩.৫৯%	২১.১৮%	১০.৯২%

শুধু মোট জমির শতাংশের বিচারেই প্রান্তিক ও ছোটজমি ২০০০ সাল পরবর্তী সময়ে দ্রুত বেড়েছে। অন্যদিকে ছোট মাঝারি জমি প্রায় মোটের উপর একই পরিমাণ বজায় আছে। মাঝারি ও বড় জমির পরিমাণ কমার কারণ হল এই সময়ে গোটা দেশে ভূমিসংস্কার চলার কারণে এবং কৃষক আন্দোলনের ফলে জমির সর্বোচ্চ উর্দ্ধসীমা কমার কারণে বিরাট বড় জমির পরিমাণ কমেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণও এর একটি কারণ।

এবার আমরা যদি নজর দিই ভারতে কৃষি উৎপাদনে কোন ধরনের ফসল চাষের প্রবণতা বাড়ছে তাহলে সেটা মোটেই আশাজনক হবে না। শেষ ২০ বছরের হিসাবটা মোটের উপর ছাঁড়াবে

কৃষিপণ্য উৎপাদনে জমির ব্যবহার (%)

	খাদ্যশস্য	তেলবীজ	তন্তুজাত ফসল	বাণিজ্যিক ফসল[১]
১৯৯০-৯১	৬৮.৯	১৩.৫	৪.৭	২৪.১
২০০৩-০৪	৬৫.৯	১৩.৮	৪.৮	২৫.১
২০০৯-১০	৬৩.৯	১৪.৯	৫.৭	২৫.৫

এই শেষ ৪ বছরে ছবিটা আরও খারাপ হয়েছে। খাদ্যশষ্য চাষ করার ক্ষেত্রে ক্রমাগত অনীহা এবং অন্যদিকে বাণিজ্যিক ফসল (যা কিনা সরাসরি শিল্প উৎপাদনের কাঁচামাল) চাষের বেড়ে চলা প্রবণতা একথা বোঝায় না কি যে আজ ভারতবর্ষে কৃষি উৎপাদন ঠিক হয় শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির দ্বারা, যা কিনা চরিত্রে পুরোপুরিই পুঁজিবাদী।

ভারতের কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমের ক্ষেত্রেও বিগত ১০ বছরে এক নতুন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যা আগে কখনো হয়নি। ১৯৯০-৯১ থেকে ২০০৩-০৪ সাল পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে নতুন শ্রমশক্তি নিযুক্ত হয়েছে প্রায় ২.৭ কোটি। কিন্তু ২০০৩-০৪ থেকে ২০১৩-১৪ সময়ে কৃষিক্ষেত্রে থেকে শ্রমশক্তি সরে এসেছে প্রায় ৩.৭ কোটি।[২] অর্থাৎ নতুন করে ১ কোটির কাছে শ্রমশক্তি কৃষিক্ষেত্র থেকে সরে এসে শহরে মজুরী শ্রমে নিযুক্ত হয়েছে। এর বেশীরভাগটাই কৃষিক্ষেত্রের অদক্ষ শ্রমিক। এই প্রবণতা সাধারণভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদনরেই বৈশিষ্ট্য—প্রযুক্তির বিকাশে, শ্রমশক্তির ক্রমসঙ্কোচন জমির কেন্দ্রীভবন এবং তুলনায় দক্ষ শ্রমিকের নিয়োগ।

ভারতের কৃষিক্ষেত্র ব্যাঙ্ক মূলধন এবং সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগও গত ১০ বছরে প্রায় ২ গুন হয়েছে। ভারতের কৃষি গণনা রিপোর্ট থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ২০০৭-০৮ সালে কৃষিক্ষেত্রে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ ছিল ২৭৯.০১ কোটি টাকা। ২০০৯-১০ সালে তা হয়ে দাঁড়াল প্রায় ১৩১৪ কোটি টাকা। গ্রামীণ বাড়ি পিছু গড় কৃষি ঋণ ১৯৯৯-২০০০ সালে ছিল মোট গৃহীত ঋণের ২৫% যা ৫ বছরের মধ্যে ২০০৩-০৪ সালে হয়ে দাঁড়ায় ৪৭%। কৃষিক্ষেত্রের মুনাফা উৎপাদনী প্রবণতার সাথে এটি সাযুজ্যপূর্ণ। ব্যক্তিগত ব্যবহারে বদলে ফসলকে বাজারজাত করা এখন সাধারণ প্রবণতা। ফলে ক্রমে চাষের খরচ বেড়েছে উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে। তাই কৃষিঋণের পরিমাণও ৫ বছর সময়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

আবার আমরা দেখছি কৃষিক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থার, যেমন সমবায় বা বেসরকারী সংস্থা, অধিগৃহীত জমির সংখ্যা বাড়ছে। আমরা যদি কেবল প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানায় চাষ করার ছবিটা দেখি তাহলে দেখা যাবে প্রান্তিক ও ছোট চাষে প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানা ১৯৮০-৮১ তে ছিল যথাক্রমে ২৮ হাজার ও ৩৫ হাজার হেক্টর। ২০১০-১১তে এসে সেটা দাঁড়াল ৪৫ হাজার এবং ৪৭ হাজার। অন্যদিকে বড় বা মাঝারি জমির ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক মালিকনা ক্রমেই কমেছে। আবার খুব বড় জমিতে প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানা মোটের উপর একই আছে। এই পরিবর্তন পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিক। বড় পুঁজি এখানে ছোট পুঁজিপতিকে গিলে খায় তুলনায় মাঝারি

১. ভারতীয় কৃষি গণনা রিপোর্ট

২. দি হিন্দু পত্রিকার প্রতিবেদন ''জবলেস গ্রোথ নো মোর''।

পুঁজিপতি বহুদিন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকে। ফলে ছোট উৎপাদক বাধ্য হয়ে একজোট হয়, সমবায় গঠন করে সমস্যা থেকে বেরোবার উপায় খোঁজে। ছোট জমির প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানার বেশিটাই এমন স্থানীয় সমবায়। কিন্তু এই যৌথ উৎপাদনও আসলে চরিত্রগত দিক থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদনেরই রকমফের।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ভারতের কৃষি উৎপাদনের রাশ আজ পুঁজির হাতে। গোটা কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনও আজ পুঁজিবাদী ঢঙেই হয়ে চলেছে। পুরনো জমিদারী উৎপাদন ব্যবস্থা আজ আর ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য নয়। বরং মুনাফার স্বার্থে কৃষি উৎপাদনই আজ ভারতের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

❐ ভূমিসংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে কিছু কথা

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারতে কৃষি উৎপাদন যখন সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিচালিত ছিল সে সময় পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কার আন্দোলন প্রকৃতপক্ষেই অবস্থার এক গুণগত পরিবর্তন ঘটায়। জমিতে বেগার খাটা, বিনা মজুরীতে জোত চাষ—যা ক্রমশই কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনকে তলানীতে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তখন মূলত বামপন্থীদের নেতৃত্বে ভূমিসংস্কার আন্দোলন গোটা উৎপাদন ব্যবস্থার চিত্রটাকেই পাল্টে দেয়। জমির ঊর্দ্ধসীমা নির্ধারণ, জমি উদ্ধার করে তা ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিলি করা এবং পাট্টাদারদের জমিতে অধিকার আইনসিদ্ধ করা ছিল মূল সংস্কার। এর ফলে মাঠে উৎপাদিত ফসলের মালিকানা এখন এল চাষীর হাতে। গোটা উৎপাদনী শক্তিটাই এক লাফে বেড়ে গেল। উৎপাদনী ব্যবস্থার চরিত্রটার বদল ঘটলো। ছোট চাষী কেবল ফসল ফলিয়ে বাড়িতে মজুত করেনা, তা বাজারে বিক্রি করে। কৃষি উৎপাদনের মূল লক্ষ্য হল বিক্রির জন্য উৎপাদন—যা চরিত্রে পুঁজিবাদী।

প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততন্ত্র আর ভারতের সরকারে বসে থাকা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির দালালদের অধিকারে থাকা রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভারতের বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের লড়াইকে সাময়িক জোরদার করার জন্য ভূমিসংস্কার আন্দোলন, যা কিনা আসলেই এক পেতি-বুর্জোয়া ধারণা, গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে সময় এই আন্দোলনের বাস্তবতা ছিল ভয়ানক এবং এই কাজ করাটা ছিল জরুরী। তখনকার পরিস্থিতিতে আর্থ-সামাজিক কাঠামোয়, পিছিয়ে থাকা সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় এই পেতিবুর্জোয়া সংস্কার প্রগতিশীল ভূমিকাই পালন করে। কিন্তু সমস্যা হল ভারতের কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনী চরিত্রের ক্রমাগত বদল ঘটতে থাকায় এই পেতি-বুর্জোয়া সংস্কার প্রগতিশীল হওয়ার বদলে ক্রমশই চালু ব্যবস্থার লেজুড়ে পরিণত হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনের বিপরীতে পেতি-বুর্জোয়া সংস্কার নিঃসন্দেহেই প্রগতিশীল, কিন্তু বুর্জোয়া উৎপাদনী ব্যবস্থায় তার পুনরাবৃত্তি কেবল বুর্জোয়া উৎপাদনের ভিত্তিকেই শক্ত করে। নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতি চালু হবার পর ভারতের অন্যান্য রাজ্যে কৃষিক্ষেত্রের বদলকে এখন আর পশ্চিমবাংলার কৃষিক্ষেত্র থেকে আলাদা করার উপায় নেই।

আমরা ভারতের মোট ৬টি রাজ্যকে বেছে নিলাম মোটের ওপর ভৌগলিক অঞ্চল হিসাবে। হরিয়ানা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, কর্নাটক ও উড়িষ্যা। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই একমাত্র বামপন্থীদের নেতৃত্বে ভূমিসংস্কার আন্দোলন ঘটেছে। পাঞ্জাবে সরাসরি পুঁজির তত্ত্বাবধানে ''সবুজ বিপ্লব'' সংগঠিত হয়েছে। হরিয়ানা এবং উড়িষ্যা হল লাগোয়া ছটি রাজ্য যেখানে প্রতিবেশী রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিবর্তন জনমনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব ফেলতে সম্ভব, এছাড়া বাকি দুটি রাজ্য উত্তরপ্রদেশ ও কর্ণাটক যেখানে ভূমিসম্পর্কের পরিবর্তন দেশের গড়পড়তা গতিতে ঘটেছে।

প্রথমে দেখি গড় জমির পরিমাণ (ব্যক্তি-মালিকানাধানী কৃষিজমি)

মাথাপিছু গড় জমি (হেক্টর হিসাবে) এবং মোট জমির শতাংশের হিসাব[১]

	প্রান্তিক (০-১ হেঃ)		ছোট (১-২ হেঃ)		ছোট মাছারি (২-৪ হেঃ)		মাঝারি (৪-১০ হেঃ)	
হরিয়ানা	০.৪৬	৩.৬%	১.৫	৪.৫%	২.৮৯	৭%	৫.৭৮	৬.৫%
পাঞ্জাব	০.৬২	২.৫%	১.৩৮	৬.৮%	২.৬৪	২১.৫৩%	৫.৭৩	৪৩.১%
উত্তরপ্রদেশ	০.৩৭	২২.৯%	১.৩৯	১০.৮%	২.৭২	৮.৩%	৫.৪১	৪.২%
পশ্চিমবঙ্গ	০.৪৯	৫২.৪%	১.৫৯	২৮.২%	২.৭৩	১৩.২%	৪.৮৬	১.৯%
কর্ণাটক	০.৪৮	১৫.১%	১.৪৯	২৪.৭%	২.৬৮	২৭.৭%	৫.৬৭	২৩.৬%
উড়িষ্যা	০.৫৭	৩৯.৬%	১.৬৩	৩০.৮%	২.৯৫	১৮.৯%	৬	৭.৮%

* ২০১০-১১ সালে হিসাব

যৌথ মালিকানার ক্ষত্রে হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশ বাদে সব জায়গাতেই জমির পরিমাণ শতাংশের হিসাবে ১% এরও কম।

এই তথ্য থেকে পরিস্কার গড় মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমশই গোটা দেশে প্রায় একই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিশেষত্ব হল অগুণতি ক্ষুদ্র কৃষি উৎপাদক। জমির পরিমান ২ হেক্টরের কম এমন উৎপাদকের হাত মোট জমির ৮০%। এদের অবস্থা বর্তমানে অর্থনৈতিক অবস্থায় হয়েছে শোচনীয়। অল্পপরিমাণ উৎপাদন এবং কৃষিপণ্যের বাজার ক্রমাগত বড় পুঁজি নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এই উৎপাদকেরা কৃষি থেকে আর লাভ করতে পারছে না। ফলে অকৃষিক্ষেত্রে শ্রমশক্তির সরে আসা চোখে পড়ছে। ফসলের ন্যায্য মূল্য ছাবি, বা সহায়ক মূল্য বাড়ানোর আন্দোলন পরিস্থিতির সাময়িক পরিবর্তন আনতে পারে। কিন্তু কখনই তা দীর্ঘস্থায়ী হবেনা। কারণ পুঁজি কখনই তার মুনাফার সুযোগ ছাড়বে না। কৃষি উৎপাদনের উপকরণের বাজার (বীজ, সার, কীটনাশক, যন্ত্রপাতি) একচেটিয়া পুঁজির দখলে। ফলে কেবল ফসলের বাজারে দরকষাকষি ক্ষুদ্র উৎপাদককে কোন স্থায়ী সমাধানের রাস্তায় নিয়ে যেতে পারবে না।

এখন স্বাভাবিক পরিণতিতে যে কথা আসবে তা হল ভূমি-সংস্কারের দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ ছোট ছোট সমবায় গঠন। পেতি-বুর্জোয়া আন্দোলন এর চেয়ে বেশী ভাবতে পারেনা। কিন্তু এই পদক্ষেপ কি নতুন হবে বা প্রচলিত উপাদন কাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে। তথ্য তা বলছে না। পুঁজি তার স্বাভাবিক গতিতেই ক্ষুদ্র উৎপাদকের হাত থেকে জমি বার করে মাঝারি/ বড় উৎপাদকের হাতে কেন্দ্রীভবন ঘটাবে। পাঞ্জাব বা কর্ণাটকে ২-৪ হেক্টর জমি মোট জমির গড়ে ২৪% যা বক্তি উৎপাদকের হাতে। পাঞ্জাবে 'সবুজ বিপ্লব' ঘটার কারণে ৪-১০ হেক্টর জমি ব্যক্তি মালিকানায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে মোট জমির ৪৩%। কর্ণাটকে এটা ২৩.৬%। অর্থাৎ পুঁজিও তার স্বাভাবিক গতিতে জমির কেন্দ্রীভবন ঘটায়, কিন্তু তা ব্যক্তির হাতে। যদিও বাস্তবে সেগুলি বড় কৃষিখামার, যাতে বিপুল সংখ্যায় মজুরী শ্রম নিযুক্ত।

আমাদের প্রতিপাদ্যটি হল একটা সময়ে পেতি-বুর্জোয়া ভূমি সংস্কার নিঃসন্দেহেই প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু সেই পদক্ষেপ কেবল চালু বুর্জোয়া ব্যবস্থার লেজুড়বৃত্তিই করবে। পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন ঘটাবে না, বরঞ্চ পুঁজিবাদী উৎপাদনকে আরও জাঁকিয়ে বসতে সাহায্য করবে।

❐ করণীয় কি?

আমাদের গোটা আলোচনার প্রতিপাদ্য ছিল কৃষি উৎপাদনের শ্রেণীচিরত্রকে বোঝা এবং তার থেকে আগামী দিনে গ্রামীণ শ্রমজীবী অংশের নেতৃত্বকে আসবে তা বোঝা এবং তাকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করা ও সংগঠিত করা। আমরা ইতিমধ্যেই দেখিয়েছি যে জমিভিত্তিক উৎপাদনী চক্রে পুঁজিবাদী উৎপাদনী সম্পর্ক কিভাবে গড়ে ওঠে। কেমনভাবে ছোট-মাঝারি মালিকানার জমিকে নির্ভর করে পুঁজিবাদী উৎপাদন টিকে থাকে এবং বাড়তে থাকে। এর পাশাপাশি যে কথাটি উল্লেখ করতে হবে তা হল কৃষি উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমশক্তির ভেতর লিঙ্গগত, জাতিগত, ধর্মীয় বা ভাষাগত বিভেধ বজায় থাকাটা কোন পরস্পরবিরোধী ঘটনা নয়। এমনকি কেউ দেখাতে পারবেন যে আপাদমস্তক পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিকদের মধ্যে এ জাতীয় বিভেদ নেই। এই জাতীয় পরিচিতি স্বত্ত্বা একান্তভাবেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রকদের তত্ত্বাবধানে টিকে থাকে। সুতরাং ভারতবর্ষের কৃষি আজও সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কে আবদ্ধ এণন ভ্রান্ত ধারণা বামপন্থীদের পক্ষে সর্বনাশই ডেকে আনবে এবং তাদের গ্রামীণ শ্রমজীবী অংশের নেতৃত্ব থেকে হঠিয়ে দেবে। ভূমিসংস্কার, যা কিনা একটা সময়ে ছিল প্রগতিশীল পরিবর্তন, তার পুনরার্তনের আজকে ততটাই পিছনের দিকে টানবে। আমরা দেখেছি যে ভূমিসংস্কার একসময় অসংখ্য ক্ষুদ্র, মাঝারি উৎপাদন তৈরী করেছিল তারাই আজ কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত পুঁজির প্রধান বাহক। এদের ঘাড়ে চেপেই পুঁজি বেঁচে থাকছে, বাড়ছে। আজ জমির উপর ব্যকিতমালিকানা তৈরী করা কখনই প্রগতিশীল পদক্ষেপ হতে পারে না। বরঞ্চ দরকার এই উৎপাদনী চক্রে সবচেয়ে নিচের স্তরে থাকা অংশকে খুঁজে বার করা এবং তাকে শহরের শ্রমজীবী মেহনতীর সঙ্গে একত্রিত করা। এ প্রশ্নে তাই ভূমিহীন ক্ষেতমজুর বা ভাড়াতে কৃষি শ্রমিকদের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। এর পাশাপাশি আর একটি অংশ পড়ে থাকে যারা আংশিক সময়ে কৃষিতে নিযুক্ত এবং বাকি সময় শহরে মজুরী শ্রমে নিযুক্ত। এরাও উৎপাদনী চক্রে একদম নীচের স্তরেই পড়ে আছে। আগামীদিনে এই অংশের সাথেই গ্রামের বাকি মালিকানা ভোগ করা উৎপাদনী শক্তির দ্বন্দ্ব তীব্র হবে। বামপন্থীদের এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং এই গ্রামীণ সর্বহারা অংশকে তার পক্ষে আনতে হবে। তবেই শ্রেণীশকিত্র ভারসাম্যে বামপন্থীরা প্রাসঙ্গিক এবং সমাজের ইতিবাচক বদল ঘটানোর লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

সমাজতন্ত্রের দিকে এগোতে ভয় পেলে আগুবাড়া যায় কি?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বা, আরও সহজ-সরল স্পষ্ট করে বললে, শ্রমিকদের বেলায় যুদ্ধকালীন সশ্রম কারাবাস এবং পুঁজিতান্ত্রিক মুনাফার যুদ্ধকালীন সংরক্ষণ।

যুষ্কার-পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র, ভূস্বামী-পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বদলী ধরা যাক বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, অর্থাৎ যে রাষ্ট্র বৈপ্লবিক উপায়ে সমস্ত বিশেষাধিকার লোপ করে এবং বৈপ্লবিক উপায় পূর্ণতম গণতন্ত্র প্রবর্তন করতে ভয় পায় না। দেখা যাবে, রাষ্ট্রটা সাচ্চা বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক হলে রাষ্ট্রীয়-একচেটে পুঁজিতন্ত্র হয়ে দাঁড়ায় সমাজতন্ত্রের দিকে একটা পদক্ষেপ, একটা পদক্ষেপের চেয়ে বেশি কিছু, তা অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য!

কেননা কোন বিশাল পুঁজিতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান একচেটে হয়ে উঠলে, তার মানে সেটা খিদমত করে সমগ্র জাতির। সেটা রাষ্ট্রীয় একচেটে হয়ে উঠলে, তার মানে গোটা কারবারটা চালায় রাষ্ট্র (অর্থাৎ জনসমষ্টির, সর্বোপরি শ্রমিক আর কৃষকদের সশস্ত্র সংগঠন, অবশ্যি থেকে থাকে যদি বৈপ্লবিক গণতন্ত্র)। কার স্বার্থে?

—হয় ভূস্বামী আর পুঁজিপতিদের স্বার্থে, সেক্ষেত্রে সেটা বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক নয়, প্রতিক্রিয়াশীল-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সাম্রাজ্যবাদী প্রজাতন্ত্র।

—নইলে বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের স্বার্থে—তাহলে সেটা সমাজতন্ত্রের দিকে পদক্ষেপ।

কেননা সমাজতন্ত্র হল স্রেফ রাষ্ট্রীয়-পুঁজিতান্ত্রিক একচেটে থেকে ঠিক পরের পদক্ষেপটা। কিংবা বলা যায়, সমাজতন্ত্র হল স্রেফ রাষ্ট্রীয়-পুঁজিতান্ত্রিক একচেটে, যেটাকে দিয়ে সমগ্র জনগণের স্বার্থের খিদমত করান হয়, আর যেটা সেই পরিমাণে আর পুঁজিতান্ত্রিক একচেটে থাকে না।

এতে কোন মধ্যপন্থা নেই। বিকাশের বিষয়গত প্রক্রিয়াটা এমনই যাতে সমাজতন্ত্রের দিকে না এগিয়ে একচেটেগুলো (যুদ্ধ সেগুলোর সংখ্যা, ভূমিকা এবং গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে দশগুণ) থেকে এগোন অসম্ভব।

হয় প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবী গণতন্ত্রী হতে হবে, সেক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের দিকে পদক্ষেপ করতে ভয় পাওয়া চলে না।

নইলে সমাজতন্ত্রের দিকে পদক্ষেপ করতে ভয় হয়, আমাদের বিপ্লবটা বুর্জোয়া বিপ্লব, সমাজতন্ত্র 'প্রবর্তন করা' যায় না, ইত্যাদি যুক্তি তুলে প্লেখানভ, দান কিংবা চের্নোভে ধরনে সেই পদক্ষেপের নিন্দা করা হয়, সেক্ষেত্রে নেমে যাওয়া হয় কেরেনস্কি, মিলিউকোভ পর্যায়, অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল-আমলাতান্ত্রিক উপায়ে দমন করা হয় শ্রমিক আর কৃষকদের 'বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক' আশা-আকাঙ্ক্ষা।

কোন মধ্যপন্থা নেই।

সেখানেই রয়েছে আমাদের বিপ্লবের মূল অসংগতিটা।

সাধারণভাবে ইতিহাসে, আর বিশেষত যুদ্ধকালে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। এগোত কিংবা হটতে হয়। বৈপ্লবিক উপায়ে প্রজাতন্ত্র আর গণতন্ত্র হাসিল করছে বিশ শতকের রাশিয়া, এখানে আগুবাড়া সম্ভব নয় সমাজতন্ত্রের দিকে না এগিয়ে, সেদিকে পদক্ষেপ না করে (সে-পদক্ষেপ প্রযুক্তি আর সংস্কৃতির মাত্রা দিয়ে উপযোজিত এবং নির্ধারিত: বৃহদায়তনে যন্ত্রে-উৎপাদন কৃষকের অর্থনীতিতে 'চালু করা' কিংবা চিনি উৎপাদনে লোপ করা যায় না)।

তবে এগোতে ভয় করা মানে হটা—যা মিলিউকোভ আর প্লেখানভদের পরমানন্দ দিয়ে কেরেনস্কির বাস্তবিকই করছেন সেরেতেলি আর চের্নোভদের নির্বোধ আনুকূল্যে।

একচেটে পুঁজিতন্ত্র থেকে রাষ্ট্রীয়-একচেটে পুঁজিতন্ত্রে রূপান্তর অসাধারণ মাত্রায় ত্বরান্বিত করে যুদ্ধটা ঐভাবে মানবজাতিকে অসাধারণ মাত্রায় এগিয়ে দিয়েছে সমাজতন্ত্রের দিকে, এমনই ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ—এটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কাল। তার কারণ শুধু এই নয় যে, যুদ্ধের বীভৎসতা প্রলেতারিয়ান বিদ্রোহ পয়দা করে—সমাজতন্ত্রের জন্যে আর্থনীতিক পরিবেশ পরিণত না হলে কোন বিদ্রোহই সমাজতন্ত্র ঘটাতে পারে না—কারণটা হল এই যে, রাষ্ট্রীয়-একচেটে পুঁজিতন্ত্র হল সমাজতন্ত্রের পুরোদস্তর বৈষয়িক প্রস্তুতি, সমাজতন্ত্রের দ্বারপ্রান্ত, ইতিহাস নামে মইখানায় সেই ধাপটা যেটা এবং সমাজতন্ত্র নামে ধাপটার মধ্যে কোন অন্তর্বর্তী ধাপ নেই।

কর্মহীন বিকাশের আষাঢ়ে গল্প : আমাদের জবাব

বাসুদেব নাগ চৌধুরী

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিটি মহান বিপ্লবী কর্মকান্ডের ব্যর্থতার পরে যা হয়ে থাকে, একদিকে বুর্জোয়া ও দক্ষিণপন্থী তাত্ত্বিকদের উল্লাস, আর অন্যদিকে 'কমিউনিস্ট' বুলি কপচানো বুদ্ধিজীবীগণ এবং কমিউনিস্ট ও বামপন্থী পার্টিগুলোর আপসকামী নেতৃবৃন্দের 'নয়া মানবদরদী' তত্ত্বের জিগির, যা অতি নৈপুণ্যের সাথে আড়াল করে চলে শ্রেণী শোষণের বাস্তব সত্যকে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। একদিকে যখন 'পুঁজিবাদই মানব-ইতিহাসের শেষ কথা' বলে প্রচার চলেছে, অন্যদিক থেকে তখন 'মানবতাবাদী'দের আওয়াজ উঠেছে এ হলো 'কর্মহীন বিকাশ',—**পুঁজিপতিদের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের পথে অনিবার্যভাবে মানবশ্রম হটে যাচ্ছে**। 'কমিউনিস্ট' মুখোশধারী পুঁজিবাদের রক্ষকদের বক্তব্যের ক্ষেত্রে সাধারণভাবেই যা হয়ে থাকে এক্ষেত্রেও তা-ই, কথাটা শুনতে যতটা সরাসরি পুঁজিবাদবিরোধী, আসলে ঘুরপথে এর মাধ্যমে পুঁজিবাদকে ঠিক ততোটাই মান্যতা দেওয়া; কারণ একথার অর্থ হল মানবশ্রম ব্যতিরেকেই পুঁজিপতিদের মুনাফা সৃষ্টি হয়ে চলেছে,—যেন গঙ্গোত্রীর বরফ গলছে না, কিন্তু গঙ্গার জল বয়েই চলেছে। বক্তব্যের সপক্ষে ব্যাখ্যা হিসাবে দাঁড় করানো হচ্ছে দুটো বিষয়কে, এক, অত্যন্ত উন্নত টেকনোলজির মাধ্যমে খুব কম সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করেই বিপুল অর্থের পণ্য তৈরী করা হচ্ছে, আর দুই, ডেরিভেটিভ ট্রেডিং-এর ফাটকা কারবারের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা যাচ্ছে; এবং ফলে আজকের বিশ্ব অর্থনীতির বিকাশে মানবশ্রমের তেমন কোন ভূমিকাই নেই, এবং মুনাফা পাওয়া যাচ্ছে বিশাল পরিমাণে আর তা পাওয়া যাচ্ছে শ্রম ছাড়াই, অর্থাৎ কিনা শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রম লুঠ না করেই! মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের তথ্য দিয়ে বলা হচ্ছে যে বিগত দশকে বিশ্বজুড়ে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (চলতি কথায় জি.ডি.পি.) বৃদ্ধির হারের তুলনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার সবসময় কম থেকেছে। প্রথমতঃ ঐ, মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনই, উদাহরণস্বরূপ, যার তথ্য অনুযায়ী ভারতের আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষ প্রায় ৪২% অথচ উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবনের জন্য সুখী মানুষ এদেশে প্রায় ৯১%, তার এ হেন তথ্যের মধ্য দিয়ে কোন সত্য প্রকাশ পায়! দ্বিতীয়তঃ, কর্মসংস্থান ও মানবশ্রম সমার্থক এ প্রতিপাদ্যের ভিত্তি কী! এ ধরনের সিদ্ধান্তসমূহের কারণ হল এ সমস্ত পার্টির নেতৃত্বে থাকা পেতিবুর্জোয়া মধ্যবিত্তদের নিজের শ্রেণীর স্বার্থ, কারণ তাদের নিজের শ্রেণীগোষ্ঠীটাও সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান দশায় অনেকাংশে উপকৃত, যা আবশ্যিকভাবেই আজকের দুনিয়ায় শ্রমের ব্যাপক শোষণকে আড়াল করতে চায়, আর সমস্যা সমাধানের নামে পার্টি ও শ্রমজীবী জনগণকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায় বুর্জোয়াদেরই আশ্রয়ে।

তথ্যের অন্তরালে থাকা সত্যকে খুঁজে বের করতে গেলে আমাদের একটু পরোখ করে দেখতে হবে, এই মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন তথা জি.ডি.পি. আসলে কিসের প্রকাশ, উন্নত টেকনোলজির মাধ্যমে মুনাফা তৈরীর পদ্ধতিটা কী, এবং ডেরিভেটিভ ট্রেডিং-এর মাধ্যমে পুঁজি বেড়ে ওঠে কীভাবে?

।। এক।।

মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে প্রকাশ করা হয় অর্থের অঙ্কে তথা টাকায়; অর্থাৎ 'উৎপাদন' বলতে এখানে প্রকৃতপক্ষে 'উৎপাদন'কে নয়, বোঝানো হয় তার 'দাম'-কে। সুতরাং জি.ডি.পি-র মাধ্যমে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে নয়, আসলে দেখানো হয়—সমস্ত উৎপাদনের মোট 'দাম'কেই।

কিন্তু 'দাম, তো সেই সমস্ত কিছুরই থাকে যা বিনিময়যোগ্য---তা উৎপাদিত হোক বা না হোক (উদাহরণস্বরূপ, কয়েক বিঘা জমি, উৎপাদিত কোন দ্রব্য নয়, কিন্তু দাম আছে)। অতএব এই 'মোট উৎপাদন দাম'-এর মধ্যে ঢুকে পড়ে সেই সমস্ত কিছুর 'দাম'-এর ওঠা-নামাও যা আদৌ উৎপাদিতই নয়। তাই 'দাম' বিষয়টার বোঝাপড়ার জন্য প্রথমে আমাদের পার্থক্য করতে হবে দুই দামের মধ্যে—যার উৎপাদন

এর পর নবম পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয়

সমাজ পরিবর্তনের সমস্ত ইতিহাসই কোন না কোন শ্রেণীর ক্ষমতা দখলের ইতিহাস—উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর কর্তৃত্ব কায়েমের ইতিহাস। ইতিহাসের সেই গতিপথে কেবল সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলই পারে মেহনতী জনগণের অধিকারকে সেই মাত্রায় পৌঁছে দিতে, যা এক শোষণহীন সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করবে। 'জবরদখল' এই লড়াই-এর এক হাতিয়ার হয়ে ওঠার লক্ষ্য ঘোষণা করছে।

সামাজিক বিবর্তনের পথে সমাজ আজ স্পষ্টতই দুই শিবিরে বিভাজিত। উৎপাদন ব্যবস্তার ওপর কর্তৃত্বকারী পুঁজিপতি শ্রেণীর আর অন্যদিকে পুঁজির বিকাশের একমাত্র ইন্ধন শ্রম, সরবাহকারী সর্বহারা শ্রমজীবী মানুষের শিবির। একদিকে মুনাফার নামে শোষণের লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে নিয়ে চলার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পর্কের পরিবর্তন আর একদিকে সংগঠিত লড়াই এর মধ্য দিয়ে মেহনতী জনগণের অধিকারকে ছিনিয়ে আনার এক আশাবাদ। সমাজ বিপ্লবীদের সামনে আশু কর্তব্য তাই বাহ্যিক এই বৈশিষ্টের ভেতরে ঢুকে শোষণের উপায়গুলোকে সূত্রায়িত করার মাধ্যমে মেহনতীর লড়াইকে এক নির্দিষ্ট লক্ষ্য দেওয়া।

উন্নততর বিজ্ঞান প্রযুক্তির ওপর একক দখলদারি বর্তমান মালিকশ্রেণীর হাতে দিয়েছে উৎপাদনের উপায় উপকরণের নতুন সম্ভার। পালটে গেছে উৎপাদন সম্পর্কও। আর তার সাথে পরিবর্তন হয়েছে শ্রেণীসম্পর্কেরও। সমাজে নতুনভাবে উঠে আসা এক উচ্চবিত্ত শ্রেণী আর উল্টোদিকে সর্বহারা শিবিরে ভিড় করা অসংখ্য গরিব, শ্রমজীবী মানুষ। একদিকে নিত্যনতুন ভোগ্যপণ্য ব্যবহারে উচ্ছাস আর একদিকে বেঁচে থাকার ন্যূনতম রসদ জোগাড়ের তীব্র লড়াই। বর্তমান এই অবস্থার নিরিখে পুঁজি তার নিজস্ব ব্যবস্থায় এনেছে পরিবর্তন। পুরোনো নিয়ম মেনে কমদামী পণ্যের উদ্বৃত্ত উৎপাদনের জায়গায় স্থান নিয়েছে ফিনান্স পুঁজির জাল থাবা বসাচ্ছে সরাসরি কৃষিক্ষেত্রে। সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী বিকাশের যেন এক নতুন চেষ্টা।

গত লোকসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে সরকার গড়েছে এক তীব্র দক্ষিণপন্থী শক্তি। শোষণের তীব্রতাকে আরও জোরালো করার লক্ষেই পুঁজি কাজে লাগিয়েছে এই শক্তিকে। 'উদারনীতি'-র নামে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে মানবসম্পদকে একতরফাভাবে মালিকশ্রেণীর হাতে তুলে দেওয়াই যেন মূল লক্ষ্য। 'উন্নয়ন'-নামক এক সোনালী পর্দার আড়ালে আদতে প্রশস্ত ও নিরাপদ করেছে পুঁজি চলাচলের রাস্তাটাকেই। আর এর পাশাপাশি একদিকে সংখ্যাগুরুর সামনে নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে আর অন্যদিকে সংখ্যালঘুর সামনে আতঙ্কের পরিবেশ গড়ার মাধ্যমে শ্রমজীবীর মধ্যে তৈরী করছে এক অবিশ্বাসের বাতাবরণ যা আদতে সঙ্কটের মূল প্রশ্নগুলোকে সরিয়ে ফেলার এক নোংরা চক্রান্ত।

আরেকটু তাকালেই লক্ষ্য করা যায় যে তীব্র এই দক্ষিণপন্থার উত্থান কেবল ভারতবর্ষেই নয় গোটা বিশ্বেই এর বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ছে। গোটা আরব দুনিয়ায় উগ্রমৌলবাদ আর সারা ইউরোপ জুড়ে ঘুমিয়ে পড়া উগ্র দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক শক্তিগুলির পুনঃসক্রিয়তা আজ সর্বহারা শিবিরের সামনে নতুন এক চ্যালেঞ্জ। ব্যতিক্রম কিউবা ও লাতিন আমেরিকা। সম্প্রতি ভেনেজুয়েলা, ইকুইটর, বলভিয়া, ব্রাজিল ইত্যাদি দেশগুলোয় সাধারণ নির্বাচন বামপন্থীর জয়, এই অংশের শ্রমজীবী মানুষের এগিয়ে চলা এই লড়াই এর জন্য জোরালো এক আশাবাদ।

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আজ এক গভীর সঙ্কটের সামনে উপস্থিত। লড়াইকে সংগঠিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আজ আর গ্রগামী বাহিনীই কোথাও যেন দিশাহীন। সমাজ বিকাশের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব, তা যে কিছু বিকল্প চেতনা দিয়ে পূরণ সম্ভব নয় আজ তা আরও একবার প্রমামিত। পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমের লড়াই কোন পথে তা কেবল নির্ধারিত তে পারে পুঁজির বর্তমান অবস্থা ও বিস্তারের গতিপ্রকৃতি এবং সর্বহারা শিবিরভুক্ত শ্রেণীগুলির পারস্পরিক অবস্থান ও জোটের তীব্র ও গভীর দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ ও বিতর্কের মাধ্যমেই। তাই আজ সমাজে ডানপন্থার বিরুদ্ধে বামপন্থা জোটবদ্ধ আন্তরিক লড়াই জরুরী ভবিষ্যত পথের দিশার খোঁজের লক্ষে।

ভূখন্ডের স্বাধীনতা না ভূখন্ডবাসীর?

অনিন্দ্য সরকার

স্বাধীনতা কার? এ প্রশ্ন বহুকালের। ভূখন্ডবাসীর বললেও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সবাই একই পংক্তিতে পড়েন না। মুখে কেউ স্বীকার করুন বা না করুন এই ভারতবর্ষের মধ্যেই দুটো ভারত আছে। একদল না খেয়ে প্রত্যেকদিন লক্ষ লক্ষ মরে—আরেকদল বেশী খেয়ে রোগে ভুগে মরে। মৃত্যু ছাড়া এই দুদল ভারতবাসীর আর কোনো মিল আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না।

স্পষ্ট কথা স্পষ্ট করে বললে অনেকেরই কষ্ট বেড়ে যায়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে কাদের উৎসাহ বেশী? বুভুক্ষু জনতার না কামানেওয়ালাদের? ৯৯% ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা এই যে, যিনি ঘটা করে স্বাধীনতার তেরঙ্গা পতাকা তোলেন, তিনি সেই এলাকার বা প্রতিষ্ঠানের সব থেকে অধম ব্যক্তিদের একজন। দেশের পতাকা যারা এতকাল ১৫ই আগস্ট তুলে এসেছেন দেশের মানুষ তাদের সম্পর্কে খুব একটা সু-বিশেষণ প্রয়োগ করেন এমনটা নয়। অনেকেই দুর্নীতি বা বহুবিধ কেলেঙ্কারীতে ভূষিত। ভারতবর্ষের বর্তমান কোটিপতি সাংসদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ আরও কামানো না জনগণের মুক্তি? মানুষকে দাস বানিয়েই তো অর্থের এই পাহাড়—তাহলে স্বাধীনতা দিবসে তাদের শপথ আরও কামানোর-দেশবাসীর আরও স্বাধীনতা হরণের। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের যে কর্ণধার পতাকা তোলেন তিনি, দেশবাসীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থে গড়ে ওঠা সেই প্রতিষ্ঠানকে ৩৬৪ দিন বেসরকারী পুঁজিপতির হাতে বিক্রি করে দেবেন এই দাসখৎ এর বিনিময়ে উক্ত পদাধিকার অর্জন করেছেন। যে জমিদার গ্রামে পতাকা তোলেন তিনি কৃষককে আরও শোষণ করার অঙ্গীকার করেন ১৫ই আগস্ট। বিচার ব্যবস্থা আর বিচারপতিরা মানুষের অধিকার রক্ষা করেছেন না হরণ তা একবার যাদের কোর্টে যেতে হয়েছে তারাই ভাল বলতে পারবেন। বড় পুঁজির মালিক ছাড়া বড় মিডিয়া বানানো যায়না—খবর ও তাই মুক্ত নয় শুধু হাওয়া তুলে রেটিং ও মুনাফা বৃদ্ধি। এহেন দেশে পুলিশ-মিলিটারী-আমলাদের তো পোয়াবারো। ৩৬৫ দিনই তাদের কাছে ১৫ই আগস্টের অবাধ স্বাধীনতা। বাকী রইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বেসকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক বন্দেমাতরম্ ধ্বনির আড়ালে আরও একবছর ছাত্রদেরকে দুইয়ে নেওয়ার শপথ নিতে নিতে পতাকা তোলেন। সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও একদল শিক্ষক নামধারী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়ে পতাকা তোলার অধিকারী হোন! ব্যতিক্রম শুধু কিছু সমবায়, অ্যাসোসিয়েশন, অবৈতনিক স্কুল, প্রকৃত সেবামূলক কেন্দ্র ও অব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। অনেক সৎ ও প্রকৃত বিদ্বজ্জন এই সব প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করে থাকেন কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমাদের মতো দেশে এইসব প্রতিষ্ঠানকে টিকে থাকতে হয় সরাসরি সরকার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে ও তাদের সততা ও নিষ্ঠা ব্যবস্থার অঙ্গ নয় বরং উল্টোটা-বিদ্রোহজাত। মোটের উপর আমি আমার যুক্তি থেকে সরছি না। আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে এখনও ধরা পড়েনি—কোনো নিরন্ন দীনহীন ভারতবাসী শতচ্ছিন্ন পোষাক পড়ে ১৫ই আগষ্ট সূর্যোদয়ের আগে থেকেই তেরঙ্গা ঝান্ডা নিয়ে ছোটাছুটি করছেন। ১৯৪৭ এ কয়েকজন করে থাকলেও ২০১৭-তে একজনও করবে না।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজির স্বাধীনতা ভিন্ন অন্য কোনো স্বাধীনতা স্বীকৃত নয়—বড়জোর পুঁজির স্বাধীনতার প্রয়োজনে যতটুকু স্বাধীনতার চর্চা করা সম্ভব ততটুকুই মান্যতা পায়। বোধশক্তি সম্পন্ন সব ভারতবাসীই এসব কথা জানেন, বোঝেন। কিন্তু তারা নিজ যুক্তির সারবত্তা খোঁজেন বিচারধারার উৎকর্ষে নয়—কতজন 'ঠিক' বলল তার উপর। অবশ্যই 'Number represents logic to some extent', কিন্তু তাহলে গ্যালিলিও যে ভুল হয়ে যান। স্থান কালের সীমার মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান শুধু খণ্ডিত সত্যেরই সন্ধান দেয় যা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মিথ্যার সামিল।

এর পর পঞ্চম পৃষ্ঠায়

ভূখন্ডের স্বাধীনতা না ভূখন্ডবাসীর?

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

আমি মানুষের পরিপূর্ণ যুক্তির আকাঙ্ক্ষায় আস্থাশীল বলেই এই যুক্তির অবতারণা করছি; এই আকাঙ্ক্ষাকে হেয় বা ছোট করার জন্য নয়। 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন আমাদের পরিচয় কোনো ভূখণ্ডের অধিবাসী হিসাবে নয়—আমরা প্রত্যেকেই বিশ্বমানবের সন্তান। ভারতবর্ষকে পুনরাবিষ্কার করে রবীন্দ্রনাথ এক মহত্তর সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করলেন—কোনো খণ্ড জাতীয়তাবোধ নয়। মার্কস শিখিয়েছেন মানুষের যুথবদ্ধ সংগ্রামই ঐতিহাসিক সত্য—ইতিহাসের চালিকাশক্তি—কোনো ভূখণ্ডের জায়গীরদারীর লোলুপ দৃষ্টির হীনতা দিয়ে এর ব্যাখা চলে না। জাতীয়তাবাদের ধ্বজা নিয়ে যারা সামনে এসে দাঁড়ান তারা ভারত ভূখণ্ডের নতুন 'ইংরেজ' এ সত্য আজ মর্মে মর্মে আমরা অনুভব করছি। ১৯৪৭-এ যতটুকু ধোঁয়াশা ছিল আজ তা সম্পূর্ণ কেটে গেছে। পুঁজিবাদ আরও পচেছে—১০০ লক্ষ ইংরেজ-এর মধ্যে ১টা ডেভিড হেয়ার পাওয়া যেত—বড়লোকতম ১ কোটি ভারতীয়র মধ্যে একজনও সেই গোত্রীয় পাওয়া যাবেনা। দেশের মানুষের মুক্তির ইচ্ছার সিঁড়ি এরা ইংরেজদের সঙ্গে আপোষ রফা করেছেন দেশের সম্পদের (প্রাকৃতিক, মানব সবই) ভাগ বাঁটোয়ারার শর্ত মেনে। এরাই পাঠ্য বইতে স্বাধীনতা সংগ্রামের আপোষহীন বীর বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেন—এরাই মিলিটারী মজদুরদের স্বাধীনতার লড়াইকে সাধারণ 'সিপাহী বিদ্রোহের' তকমা এঁটে দেন। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগের সমস্ত কৃষক সংগ্রাম-আদিবাসী বিদ্রোহকে এরা সিলেবাসের বাইরে পাঠিয়ে দেন। এরা ভগৎ সিংদের ফাঁসি, জালিওয়ানালাবাগের হত্যাকান্ডে চতুর মৌনতা অলম্বন করে ছিলেন। পূর্ণ স্বরাজের দাবী ইংরেজ বাহাদুরদের কাছে উত্থাপন করতে এদের প্রায় হিক্কা উঠে গিয়েছিল। এদের ভাবধারার পরের প্রজন্ম জরুরী অবস্থার সমর্থক—হালে যারা কলকাতাকে লন্ডন বানানোর স্বপ্ন দেখছে! আত্মসুখী, স্লোগান সর্বস্ব, পলায়নপর, রাজনীতিজীবি এই সব জাতীয়তাবাদীদের রবীন্দ্রনাথ তীব্র কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন ''ঘরে বাইরে'' উপন্যাসে সন্দীপ এর চরিত্রে। শুধু এখানেই নয়, গোটা রবীন্দ্রসৃষ্টির ছত্রে ছত্রে জাতীয়তাবাদী মোহের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম পরিলক্ষিত হয়। দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে যারা দেশের স্বাধীনতা নিয়ে বেশী ব্যস্ত, রবীন্দ্রনাথ তাদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত।

'...আধুনিক পলিটিক্সের শুরু থেকেই আমরা নির্গুণ দেশপ্রেমের চর্চা করেছি, দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে। এই নিরুপাধিক প্রেমচর্চার অর্থ যাঁরা জোগান তাঁদের কারও বা আছে জমিদারি, কারও বা আছে কারখানা; আর শব্দ যাঁরা জোগান তাঁরা আইনব্যবসায়ী। এর মধ্যে পল্লীবাসী কেনো জায়গাতেই নেই; অর্থাৎ আমরা যাকে দেশ বলি সেই প্রতাপাদিত্যের প্রেতলোকে তারা থাকে না। তারা অত্যন্ত প্রতাপহীন—কি শব্দসম্বলে, কি অর্থসম্বলে।...

...যে স্নায়ুজলের যোগে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেদনা দেহের মর্মস্থানে পৌঁছয়, সমস্ত দেহের আত্মবোধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বোধের সম্মিলনে সম্পূর্ণ হয়, তার মধ্যে যদি বিচ্ছিন্নতা ঘটে তবে তো মরণদশা। সেই দশা আমাদের সমাজে। দেশকে মুক্তিদান করবার জন্যে আজ যারা উৎকট অধ্যবসায়ে প্রবত্ত এমন-সব লোকের মধ্যেও দেখা যায়, সমাজের মধ্যে গুরুতর ভেদ যেখানে, সেখানে পক্ষাঘাতের লক্ষণ, সেখানে তাঁদের দৃষ্টিই পড়ে না।'

স্লোগানের গোপনে আসলে এরা দেশদ্রোহীর পতাকা গোপনে বয়। এদের কাছে স্বাধীনতার মর্মবস্তু ''নতুন ভারত গড়ার শপথ'' নয়; ১৫ই আগস্ট-এর গালা পাগলু ড্যান্স।

এতকাল ভারতবর্ষের বামপন্থীরা এই অপসংস্কৃতির বাইরে ছিল। কলজের যাদের জোর ছিল—তারা বলেছিল, বুঝেছিল ''ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়''। এই উচ্চারণকে স্লোগান হিসাবে দেখে তার ভুল ঠিক বিচার করতে যাওয়া মূর্খামি। অর্জিত স্বাধীনতাকে অসম্মান নয়—বরং বামপন্থীদের সেই সিদ্ধান্ত মানুষের অপরাজেয় মুক্তি আকাঙ্ক্ষার প্রতি প্রকৃত সম্মান জানানো—সমস্ত রকম শোষণ-নির্যাতনের শৃঙ্খল ছিন্ন করার ''অসীম আশাবাদ''। রক্তস্নাত, স্বজন-বন্ধু বিয়োগান্ত চিন বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই মাসে তুঙ স্মরণ করিয়ে দেন ''মহান চীনা জনগণের বিপ্লবী কর্মসূচীর এখন ক্লাইম্যাক্সও নয়—সূচনা মাত্র''।

বিপ্লবী আহ্বান দেওয়ার ধক না থাকলে কলজে শুকিয়ে গেলে, তাই তেরঙ্গা তুলে আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত দিতে হয়। মুখে না বলেও বুঝিয়ে দেওয়া যায় ''আমরা ব্যবস্থাটায় আস্থাশীল—বিতর্ক শুধু সরকারে কে থাকবে তাই নিয়ে''। ব্যবস্থাটা বুর্জোয়া একনায়কত্ব নয়, বুর্জোয়া গণতন্ত্রই এই প্রচারকে মান্যতা দেওয়া হয়। সমাজের খোলনলচে বদলের স্বপ্ন আর পুরনো কত কথা দাসত্বের ক্ষুধিত বশ্যতার হাহাকারে পর্যবসিত হয়। হাস্যকর বিষয় একটাই। এ সবই করা হয় ''মানুষ এসব চাইছে'' আর ''পরিস্থিতির পরিবর্তন'' এর অজুহাতে। জেলে পচে মরা গ্রামসির ''সম্মতির নির্মাণ'' বামন্থীদের কাছে এক ভ্রষ্ট স্মৃতির মতো। স্বাধীনতার খোয়াবে অনাক্রান্ত কমরেড লেনিনের চেতাবনী বোধহয় তাদের সরকার চালাতে গিয়ে পড়া হয়ে ওঠেনি সময়ের অভাবে।

'বুর্জোয়া গণতন্ত্র শুধু গালভরা কথার, জমকালো বুলির, সাড়ম্বর প্রতিশ্রুতির আর **স্বাধীনতা ও সাম্যের** বড়ো ধ্বনির গণতন্ত্র। কিন্তু কাজের বেলায় এই গণতন্ত্র মেয়েদের স্বাধীনতা-হীনতা ও অসাম্য, মেহনতী ও শোষিতের স্বাধীনতা-হীনতা ও অসাম্যকে আড়াল করে।...

...ধ্বংস হোক এই জঘন্য মিথ্যা! অত্যাচারী ও অত্যাচরিতের মধ্যে, শোষক ও শোষিতের মধ্যে কখনও 'সাম্য' হতে পারে না, নেই, হবে না। যতক্ষণ না পুরুষের আইনগত বিশেষ সুবিধা থেকে মেয়েরা স্বাধীনতা পাচ্ছে, যতক্ষণ পুঁজির কবল থেকে শ্রমিকের, এবং পুঁজিপতি, জমিদার ও বণিকের জোয়াল থেকে মেহনতী কৃষকের স্বাধীনতা না থাকছে, ততক্ষণ প্রকৃত 'স্বাধীনতা' হতে পারে না, নেই, হবে না।

মিথ্যাবাদী ও ভণ্ডেরা, নির্বোধ ও অন্ধেরা, বুর্জোয়া ও তাদের সমর্থকরা সাধারণ স্বাধীনতা, সাধারণ সাম্য ও সাধারণ গণতন্ত্রের কথা বলে লোক ঠকাবার চেষ্টা করতে চায় করুক।

শ্রমিক ও কৃষকদের কাছে আমরা বলি: মুখোশ খুলে দাও এই সব মিথ্যাবাদীদের, চোখ খুলে দাও এই সব অন্ধদের। জিজ্ঞাসা করো:

'নারী পুরুষ কার সঙ্গে কার সাম্য?'

'কোন জাতির সঙ্গে কোন জাতির সাম্য?'

'কোন শ্রেণীর সঙ্গে কোন শ্রেণীর সাম্য?'

'কোন জেয়াল থেকে অথবা কোন শ্রেণীর জোয়াল থেকে স্বাধীনতা? কোন শ্রেণীর জন্য স্বাধীনতা?'

এই প্রশ্নগুলি না **উত্থাপন করে,** তাদের সর্বাগ্রে স্থান না দিয়ে, এগুলি লুকাবার, ধামাচাপ দেবার ও এড়িয়ে যাবার বিরুদ্ধে লড়াই না করে যে রাজনীতি, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য ও সমাজতন্ত্রের কথা বলে সে মেহনতকারীর চরম শত্রু, মেষচর্মে সে নেকড়ে, শ্রমিক ও কৃষকের অতি কুটিল প্রতিপক্ষ, এবং জমিদার, জার ও পুঁজিপতি ভৃত্য।'

আর ''পরিস্থিতি পরিবর্তনের'' দোহাই দেওয়া বামপন্থীদের কাছে এক হাস্যকর ব্যাপার কারণ পরিস্থিতির পরিবর্তনের শক্তি হিসাবেই তাদের সমাজে জন্ম।

পরাধীনতার গ্লানি আর আত্মত্যাগের প্রাথমিক সাফল্য অর্জনের ৬৭ বছর বাদে তেরঙ্গা আর বন্দেমাতরম আজ আত্মসিদ্ধির প্রতীকে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে জাঁকজমকের আড়ালে এই সত্যকে দেশের শাসকরা চাপা দিতে চায়। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন আমেরিকা যখন কোনো দেশ দখল করতে যায় তখন অভিযানের নাম দেয় ''operation freedom''! এদেশেও তাই। ১৫ই আগস্ট পালনে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়—চল ভাই আমরা সবাই স্বাধীন—কেউ যেন বাপু নিজেকে শোষিত, অত্যাচারিত ভেবে বোসো না।

দেশের মানুষ যখন এসব নাটক বুঝে গেছে, ঠিক তখনই বামপন্থীদের একাংশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তেরঙ্গাবৃত্তে প্রবেশ করতে চাইছেন। মানুষ এদের ক্ষমা ঘেন্না করে দু-চারটে ভোট দিতে পারে কিন্তু কখনও সম্মান করবে না—সিকিভাগ শক্তি নিয়েও এদের পূর্বসূরীরা যে সম্মান পেয়ে থাকতেন। কমরেড লেনিন বলতেন ''মানুষের বিশ্বাস হারানো ছাড়া আর কিছু হারানোর ভয় আমি করিনা''। বিশ্বাস অর্জন করতে অর্ধশতাব্দীর সংগ্রামও যথেষ্ট নয়; ভাঙতে কিন্তু একদিনই লাগে। আত্মহননকারী এই সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণ একদিন বামপন্থীদেরই করতে হবে, সিদ্ধান্তকারীদের কেউ তখন সদর দপ্তরে তালা লাগাচ্ছেন—কেউ বা সব অধঃপতিতের আশ্রয়স্থল আমেরিকায় হলিউডী সতী-স্বাধ্বী বারাঙ্গনাদের হাত ধরে নিভৃতে কৃতকর্মের সুখস্মৃতি রোমন্থন করছেন।

কম: পি. সুন্দারাইয়া-র ইস্তফাপত্রের নির্বাচিত অংশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গ্রুপ ও ব্যক্তির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবে। সাধারণ সংগ্রামে ব্যাপকতম জনসমাবেশ ঘটাতে পার্টি কর্তৃক সকল প্রচেষ্টা অবশ্যই করতে হবে এমন ঐক্যের জন্য।"

আমি মনে করি এর অর্থ এই, যে সমস্ত পার্টি (জনসংঘকে অন্তর্ভুক্ত করে—পি.এস.), গ্রুপ ও ব্যক্তির সঙ্গে উপর থেকে যুক্ত সংগ্রাম ও যুক্ত সংগ্রাম কমিটি—আমাদের থাকতে পারে এবং ''সকল প্রচেষ্টাই তার জন্য অবশ্যই করতে হবে,'' এবং পাশাপাশি ''এই ধরণের একটি আন্দোলন নীচু থেকে গড়ে তুলতে হবে''। এটি জনসংঘের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক যুক্তফ্রন্ট ছাড়া আর কিছুই নয়, যদিও 'কেন্দ্রীয় কমিটি এটি পরিষ্কার করে দিতে চায় যে এই ঐক্য শুধুমাত্র নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ' এবং যদিও কেন্দ্রীয় কমিটি তার সুপরিচিত অবস্থানেরই পুনরাবৃত্তি করছে যে জনসংঘ ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক যুক্তফ্রন্টের কোন প্রশ্নই নেই।

১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে গৃহীত কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্বের খসড়া দলিল যা রাজ্য কমিটি ও জেলা কমিটি এবং রাজ্য প্লেনামগুলিতে পাঠানো হয়েছিল আলোচনার জন্য, কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত রূপদানের পূর্বে তাতে বলা হয়েছিল: ''অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির (দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধী পার্টি, কংগ্রেস (ও), বি.এল.ডি. কোন কোন ক্ষেত্রে জনসংঘ) সঙ্গে যুক্ত সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলার দরকার হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সেগুলিকে অবশ্যই প্রচার কমিটিতে পর্যবসিত হতে দেওয়া হবে না যাতে এই পার্টিগুলির সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট কমিটি গঠনের ছাপ পড়ে।"

যেহেতু জরুরী অবস্থা একটি দীর্ঘসূত্রী ব্যাপার, জনসংঘ এবং অন্যান্য দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক পার্টিগুলির সাথে নাগরিক অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জরুরী অবস্থার ইতি টানার নামে যুক্ত সংগ্রাম কমিটি হবে একটি দীর্ঘসূত্রী ব্যাপার, এবং সেইজন্য এইরকমের একটি মোর্চা বা যুক্ত সংগ্রাম কমিটি জনসাধারণের সামনে একটি রাজনৈতিক যুক্তফ্রন্টের ছাপ ফেলতে বাধ্য।

তদুপরি, একটি বুর্জোয়া—গণতান্ত্রিক নাগরিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামকে বৃহৎ বুর্জোয়াদের দ্বারা পরিচালিত বুর্জোয়া-জমিদার সরকারের এক-দলীয় স্বৈরাচারী শাসনের অধীনে নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সঙ্গে এক করে ফেলা ভুল। শেষোক্ত সংগ্রামটি এক-দলীয় স্বৈরাচারী শাসনকে অপসারণ করে বিভিন্ন শ্রেণী সমন্বয়ে গঠিত গণতান্ত্রিক রাজ কায়েম করার সংগ্রাম। সেইজন্য, দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলি ও জনসংঘ সহ সমস্ত রাজনৈতিক পার্টিগুলির একটি ফ্রন্ট রাজনৈতিক ফ্রন্ট ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না এবং তাই তা কখনোই এই লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে না এবং অবশ্যই খুব ক্ষতিকর হবে। (আমার—পি.এস)

জনসংঘ সহ অন্যান্য দক্ষিণপন্থী বিরোধী পার্টিগুলির সঙ্গে যুক্ত সংগ্রাম ও যুক্ত সংগ্রাম কমিটি গঠনের এই ধারণা আমাদের পার্টি ও পার্টি নেতৃত্বে একটি ধারাবাহিক ধারণা।

১) লোকসভার সদস্য ও আমাদের লোকসভা দলের হুইপ জ্যোতির্ময় বসু এ ব্যাপারে সবচেয়ে জ্বলন্ত উদাহরণ। তিনি তাঁর অবস্থানকে ব্যবহার করেছেন এবং বার বার সতর্কীকরণ করা সত্ত্বেও তিনি জনসমক্ষে তাঁর বিবৃতিদান ও লোকসভার কার্যকলাপ এমনভাবে চালিয়ে গেছেন যাতে জনমানসে এই ধারণা জন্মায় যে প্রকৃতপক্ষে লোকসভায় জনসংঘ থেকে সি.পি.আই.(এম) পর্যন্ত একটি ঐক্যবদ্ধ বিরোধী ব্লক আছে। এ ব্যাপারে তাঁর সর্বশেষ কাজটি হচ্ছে ১৯৭৫ সালের ১৬ই জুন অথবা ঐ সময় আমাদের পার্টি সি.পি.আই(এম)-এর পক্ষ থেকে ''পর্যবেক্ষক'' হিসেবে জনতা ফ্রন্টের নেতাদের সভায় যোগদান করা। আমি তাঁকে একটি টেলিগ্রাম পাঠাই এই মর্মে যে ইন্দিরাকে পদত্যাগে বাধ্য করার জন্য কর্মসূচী প্রণয়নে জনতা ফ্রন্টের নেতাদের ২২শে জুন থেকে প্রস্তাবিত সভায় যোগদান আমাদের পার্টির নীতি ও সকল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবং আমি তাঁকে যোগদান করতে নিষেধ করি। তথাপি তিনি এই সব নেতাদের ২৫শে জুনের সভায় যোগ দেন।

পলিটব্যুরো তাঁকে নিয়মানুবর্তী করতে পারেনি, কারণ, অধিকাংশ পলিটব্যুরো সদস্যই তিনি যে ক্ষতি করেছিলেন, তা দেখেননি এবং বিশেষ করে যখন পশ্চিমবাংলার পলিটব্যুরো সদস্যরা তাঁর কার্যকলাপকে গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছিলেন না, তখন অন্যান্য রাজ্যের অন্যান্য পলিটব্যুরো সদস্যরাও এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের বিষয় করে তোলার প্রয়োজন মনে করেন নি।

২) জয়প্রকাশের নেতৃত্বে বিহার ও গুজরাট আন্দোলনের অনুসরণে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটি অনুরূপ আন্দোলন গড়ে তোলায়, তাঁর প্রয়াসের সঙ্গে ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাস থেকে কমরেড পি.আর., জ্যোতি এবং বি.টি.আর. যুক্ত সংগ্রাম অথবা ঘনিষ্ঠ সংহতিমূলক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার সপক্ষে বলছিলেন। পি.আর. এমনকি জেপি-র সারা ভারত কো-অর্ডিনেশান কমিটিতে যোগ দেওয়ার কথাও বলেন। জে.পি-র নেতৃত্বে পার্লামেন্টের সামনে ১৯৭৫ সালের ৬ই

মার্চের বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেওয়ার ওকালতি করছিলেন তাঁরা। ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে বি.টি.আর. একটি দলিল পেশকরেন, যাতে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে মার্চের বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ না করা আমাদের পক্ষে ভুল ছিল, এবং ইন্দিরা কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে জে.পি-র নেতৃত্বে আন্দোলনের সঙ্গে যে আমরা ঐক্যবদ্ধ ও তার প্রতি যে আমাদের সংহতি আছে, তা জনগণকে দেখানোর একটা ভাল সুযোগ আমরা নষ্ট করেছি।

৩) যখন কেন্দ্রীয় কমিটি ''মানবিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন''-এই প্রস্তাব পাশ করল এবং আর একটি আলাদা প্রস্তাবে জে.পি.-র কো-অর্ডিনেশন জোটের সঙ্গে ৬ এপ্রিলকে জরুরী অবস্থা বিরোধী দিবস হিসেবে উদযাপন করতে বলল, যাতে কেন্দ্রীয় কমিটি শুধুমাত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতা, জরুরী অবস্থা তুলে নেওয়া এবং মিসা, ডি.আই.আর ও অন্যান্য নিপীড়নমূলক পদক্ষেপ পত্যাহার করার প্রশ্নে অনুগত ছিল, তখন তাকে জনসংঘ ও জেপি জোটের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রামের অনুমতি হিসেবে গ্রহণ করা হল। *সেইজন্য আমি তাদের এই ক্ষুদ্র দাবীকে প্রকৃতপক্ষে ইন্দিরা কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে জনসংঘ সহ সমস্ত দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলির সাথে যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের বৃহৎ দাবী বলে চরিত্রায়ণ করি।*

রাজ্য কমিটি ও জেলা কমিটি অথবা রাজ্যপ্লেনামগুলির কাছে পাঠানো কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসের খসড়া দলিল এই ধারণাকে আরো শক্তিশালী করেছে। *কমরেড ই.এম.এস একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন এই মর্মে যে আমাদের পার্টি জেপি-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রাম করতে কোন কোন রাজ্যে কংগ্রেস (ও) এর সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত করতেও প্রস্তুত।* এই বিবৃতি কেন্দ্রীয় কমিটির এপ্রিল খসড়ার ঠিক পরেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

৪) সমগ্র বিতর্কটি কেন্দ্রীভূত হয় পলিটব্যুরোর নির্দেশ অমান্য করে বি.এম.এস-কে মজুরী সংকোচন বিরোধী সম্মেলনে আমন্ত্রণ ও বি.এম.এস-র ছাপায় ভুল অংশ একটি গঠন নিয়ে। পি.আর-এর বক্তব্য অনুসারে, তিনি এটিকে রোধ করতে পারেননি, কারণ, আমাদের পার্টির অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতারাই সারা ভারত সংগ্রাম কমিটির ধারণার বিরোধী ছিলেন। যখন সম্মেলনটি আহুত হয়, তাঁদের দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদিত হয় নি কেন বি.এম.এসকে আমাদের ঐক্যবদ্ধ ট্রেডইউনিয়ন সংগ্রাম কমিটি থেকে বাইরে রাখা হবে। পরে কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা আহুত ও পরিচালিত মজুরী সংকোচন বিরোধী এবং সেই সংগ্রাম কমিটির থেকে আর একটি সারা ভারত ধর্মঘট অথবা গণ-সংগ্রামের আহ্বানে অনুমতি দেওয়া হয়। এমনকি আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের জন্য অপেক্ষা না করে তা ৯ এপ্রিল মজুরি-স্থিতিশীলতা বিরোধী সংগ্রাম কমিটির বৈঠকের এক সপ্তাহের মধ্যেই হবার কথা ছিল। আর কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে না, এই মর্মে আগের কেন্দ্রীয় কমিটি বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও এটা করা হয় যাতে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া পূর্বাহ্নেই বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৫) ২৬শে জুন অভ্যন্তরীন জরুরী অবস্থা ঘোষণার ঠিক কয়েকদিন আগে আমাদের পার্টির মালয়ালম ভাষার দৈনিক পত্রিকা ''দেশভিমানী'' তে লিখিত 'বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উপর' প্রবন্ধে ই.এম.এস. জনসংঘ ইত্যাদির মত দক্ষিণপন্থী বিরোধী পার্টির সঙ্গে ইন্দিরা সরকার বিরোধী ফ্রন্টের ওকালিত করেছেন। ১৯৩০-এর দশকে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বারা সমর্থিত ফ্যাসিবাদ বিরোধী ফ্রন্ট এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইঙ্গ-আমেরিকান মিত্র শক্তির হিটলারের বিরুদ্ধে একত্রে যুদ্ধ করার উদাহরণের সাহায্যে তিনি এর যৌক্তিকতা প্রমাণ করেন। ইন্দিরাগান্ধী সরকারের বিরুদ্ধে জনসংঘের সঙ্গে ফ্রন্টের ওকালতির সমর্থনে তাঁর যুক্তি এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ফ্রন্ট ও হিটলালের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ও ইঙ্গ-আমেরিকান মিত্র শক্তির যুদ্ধের উদাহরণ টেনে আনাকে আমি মনে করি ভুল, যান্ত্রিক এবং ভারতবর্ষের বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে বেমানান।

যে পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রগুলি দুনিয়াকে নতুন করে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল এবং বিশেষ করে তখনকার একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশের উপর ফ্যাসিবাদী আক্রমণ সংগঠিত হয়েছিল, এবং যাতে করে ঐ মৈত্রী ফলবতী হয়েছিল, আমি মনে করি না তা আজ আমাদের পরিস্থিতিতে প্রযুক্ত হতে পারে এবং যেখানে জনগণকে শাসক শ্রেণীকে উৎখাত করতে ও ক্ষমতা দখল করতে হবে।

এমনকি যখন জাপানীরা চীন আক্রমণ করেছিল এবং পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রতিরোধ যুদ্ধ চলছিল, তখন মুক্তাঞ্চল ও নিজস্ব লালফৌজকে টিকিয়ে রেখে চীনা পার্টি চিয়াং-কাইশেক সরকারের সঙ্গে একটি জাপান বিরোধী ফ্রন্ট গড়ে তুলেছিল, অথবা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে গড়ে তুলতে বাধ্য করেছিল, *ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই নীতিও প্রযোজ্য নয়।*

আমার ১৩ই জুলাইয়ের লেখা থেকে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলি নিয়ে পলিটব্যুরোর খসড়া সংশোধনী হিসেবে যোগ করতে আমি দাবি জানিয়েছিলাম, কিন্তু অন্যান্যদের দ্বারা তা প্রত্যাখ্যাত হয়। সংশোধনীটি ছিল নিম্নরূপ:—

''কেরালা ও পশ্চিমবাংলায় যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের উৎখাতের পর ও অত্যাচার নামানোর পর, বিশেষ করে ১৯৭২ সালে পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন কারচুপির পর বৃহৎ-বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর একদলীয় একনায়কত্বে দ্রুত ক্রমবর্ধমান বিপদের কথা আমাদের বোঝা উচিত ছিল। শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের গণ-আন্দোলন ও তাদের সংগঠন এবং আমাদের পার্টি ও তার গোপন সংগঠন কাঠামো আমাদের এমন ভাবে গড়ে তোলা উচিত ছিল যাতে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারতাম এবং সঠিক মুহূর্তে প্রত্যাঘাত করতে সক্ষম হতাম।''

''আমরা ব্যর্থ হয়েছি তার কারণ পশ্চিমবাংলায় সংসদীয় গণতন্ত্র নাকচ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষের বাকি অঞ্চলে বেশ দীর্ঘদিন ধরে সংসদীয় গণতন্ত্র চলতে থাকবে এবং আমাদের পার্টি আগে মতই আইনসংগত উপায়ে কাজ করতে পারবে—এই ভ্রান্ত ধারণা আমরা পোষণ করেছিলাম।''

''যখন ইন্দিরা-কংগ্রেস সরকার জনগণের প্রধান শত্রুতে পর্যবসিত হয়েছে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রকে খতম করে একদলীয় স্বৈরাচার বেশি বেশি করে চালাতে শুরু করেছে তখনও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির যুক্ত ফ্রন্ট বাস্তবে গড়ে ওঠেনি। বিহারে জয়প্রকাশের নেতৃত্বাধীন আন্দোলন এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জনসংঘ, বি.এল.ডি ও কংগ্রেস (ও) ইত্যাদি পার্টির সঙ্গে জনতা ফ্রন্টে যোগদানের মাধ্যম সোস্যালিস্টরা তাদের 'মহান ঐক্যের' নীতিতে ফিরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির যুক্তফ্রন্ট গঠনের যাওবা সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল—সব শেষ হয়ে গেছে।''

জনসংঘের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রামের এই আহ্বান আমাদের পার্টির পক্ষে সেই সরু কিনারা যেখান থেকে বাস্তবে ''মহান ঐক্যের'' নীতিতে পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, যেমনটি কেরালা কমিটির সারকুলারে প্রদর্শিত হয়েছে। আমাদের পার্টি ও শাসক কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে বাম গণতান্ত্রিক শক্তির যুক্তফ্রন্ট গঠনের ক্ষেত্রে এটি আত্মঘাতী।''

১৭।৭।৭৫ তারিখের পলিটব্যুরো সিদ্ধান্ত থেকে ''একটি গণতান্ত্রিক শাসন দ্বারা এক দলীয় স্বৈরাচারী শাসনের পরিবর্তন কর''—এই স্লোগানকে কেটে বাদ দিয়ে কম: এম.বি ও সুরজিৎ তাঁদের ৩।৯।৭৫ তারিখের নোটে বলছেন, ''আমাদের অভিমত এই জে.পি গোষ্ঠী এবং জগজীবন রামের নেতৃত্বে কংগ্রেস এম.পিদের অংশটির ২৩।২৪শে জুন ঐক্যবদ্ধ হবার এবং বর্তমান কংগ্রেস সরকারকে জগজীবন রামের কংগ্রেস উপদল ও জে.পি. গোষ্ঠির দ্বারা গঠিত অন্য একটি সরকারের দ্বারা অপসারণের প্রচেষ্টার থেকে আমাদের অবশ্যই স্পষ্ট করে সীমানা নির্দেশ করতে হবে। এলাহাবাদ রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পদত্যাগ দাবি করা যেমন আমাদের পক্ষ থেকে চূড়ান্তভাবে সঠিক, তেমনি আবার পার্টির পক্ষে ভুল হবে ২৯শে জুন থেকে ৫ই জুলাই ১৯৭৫ পর্যন্ত পরিকল্পিত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া বা জগজীবন রামের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীকে সমর্থন জানানো।''

''আমরা মনে করি যে, জরুরী অবস্থা ও আমাদের কর্ত্তব্যের উপর কেন্দ্রীয় কমিটির চূড়ান্ত প্রস্তাব উপরে উল্লিখিত দিকগুলি এত পরিষ্কার ও তীব্রভাবে উপস্থাপিত করেনি।''

এম.বি. ও সুরজিতের নোটের উপর মন্তব্য কতে গিয়ে কমরেড পি. আর বলছেন, ''ইন্দিরা গান্ধীর পদত্যাগের দাবির নিশ্চিত অর্থ আর একজন কারো দ্বারা, খুব সম্ভবত জগজীবনের দ্বারা তাঁর অপসারণ। নতুন যে শক্তি সমাবেশ ঘটেছে, তার জন্য কি এই দাবিটা ভুল ছিল? জগজীবন রামের ইন্দিরাকে অপসারণের ক্ষেত্রে আমাদের সরাসরি যোগ দেওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। যদি তিনি পদত্যাগ করেন, কংগ্রেস পার্টির নেতা নির্বাচনের জন্য আমাদের সমর্থনের জন্য কে আমাদের অনুরোধ করবে?''

আমরা এই প্রশ্নের সম্মুখীন নই, আমরা জানি যে তিনি পদত্যাগ করছেন না। তবে কি আমদের জে.পি. ও জনসংঘ জোটের সঙ্গে যুক্ত প্রচার ও সংগ্রামে যোগ দেওয়া উচিত, যাতে জগজীবন রাম প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন? পি.আর স্পষ্টতই তার সপক্ষে, নতুবা ইন্দিরার পদত্যাগ দাবি করার সঙ্গে সঙ্গে একটি বাম ও গণতান্ত্রিক সরকার দ্বারা তাঁর সরকারের অপসারণের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার মধ্যে ভুল কোথায়? বাস্তব শক্তি বিন্যাসে আমাদের শ্লোগান হয়ত অর্জিত হবে না, কিন্তু সে কারণে কি ইন্দিরা সরকারের চেয়ে কম বিপজ্জনক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জগজীবন রামকে পেতে আমরা জনসংঘ ও জে.পির অভিযানে যোগ দিতে আত্মসন্তুষ্ট হতে পারি?

আর এস. এস. আনন্দমার্গী ও জামাইত-ই-ইসলামীকে বে আইনী করা সম্পর্কে

কেন্দ্রীয় কমিটি প্রস্তাবের চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: ''আর.এস.এস. শিবসেনা এবং এই ধরনের অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে আমাদের পার্টি-ই সবচেয়ে ধারাবাহিক ভাবে সংগ্রামী থেকেছে। সর্বদাই পার্টির অভিমত থেকেছে এই যে, এই ধরনের সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ভাবে সংগ্রাম করা উচিত'' আমি মনে করি, এই বাক্যটি খুবই ভুল—এর অর্থ এই যে, আর.এস.এস. আনন্দমার্গী জামাইত-ই-ইসলামীকে সরকারের বেআইনী ঘোষণা করাকে আমরা সমর্থন করিনা। অতীতে ১৯৪৮ সালে এবং আরো কিছুদিন পরে আমরাও আর.এস.এস.কে বেআইনী ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছি (আমি এখনই সঠিক প্রসঙ্গগুলি উদ্ধৃত করতে পারছি না)। তদুপরি, সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় ও জনগণ বিরোধী সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা করার দাবি আমাদের পার্টি বা কোন গণতান্ত্রিক সংগঠনের পক্ষে কি করে ভুল হতে পারে?

''এক ধাক্কা অউর দো''

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যেগুলোকে খুব সচেনতভাবেই ধামাচাপা দেওয়া হয়, শুধুমাত্র এই সমাজের মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার্থে।

দীর্ঘদিন ধরেই শোষণ ও চূড়ান্ত অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছিলেন, এই রাজ্যের ট্যাক্সি-ড্রাইভারেরা। এই শোষণ ও বঞ্চনা সেদিন চরমে উঠল, যেদিন যাত্রী প্রত্যাখ্যানকে অপরাধের আখ্যা দিয়ে, রাজ্য সরকার জরিমানা করার সিদ্ধান্ত করল ট্যক্সিচালকদের উপর। সরকারের মূল কথা হল, একজন ট্যাক্সিচালক ফাঁকা গাড়ী নিয়ে রাস্তায় থাকলে, যেকোনো সময়ে, যেকোনো অবস্থায়, যেকোনো দূরত্বে যাত্রী নিয়ে যেতে বাধ্য থাকবে। অন্যথায় ৩২০০ টাকা জরিমনা করা হবে চালকের। প্রতিদিন পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়িয়ে পরিবহন শ্রমিকদের উপর যে অত্যাচার এতদিন চালাচ্ছিল, তার সবচেয়ে জঘন্য রূপটাই ধরা পড়ে গেল, এই নিষ্ঠুর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। ''রাত এগারোটায় যখন আমি সি.আর.এ্যভিনু দিয়ে গ্যারেজ ফিরছি, তখন গড়িয়ার প্যাসেঞ্জার না তুললে, ফাইন করাটা কি জুলুমবাজী নয়?'' বললেন, উত্তর কলকাতার এক মধ্যবয়সী ট্যাক্সি-ড্রাইভার। আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ কলকাতা ও হাওড়ার বিভিন্ন ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডে চালকদের সাথে কথা বলে, তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি:

চালকের আয় ব্যায়—

দৈনিক কাজের গড় সময় (ঘণ্টা)	ট্যাক্সি-চালিয়ে গড় দৈনিক আয়	ব্যায় (দৈনিক)		
		মালিকের পাওনা	পেট্রল	অন্যান্য (ঘুষ + Case)
১২-১৪	১২০০-১৫০০*	৩৫০-৪০০	৭০০-৮০০	১০০

* ট্যাক্সি চালিয়ে দৈনিক আয়ের পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়। তবে তা সর্বোচ্চ ৩৫০০ টাকা, তার বেশী কখনোই নয়।

সারণীটি থেকে খুব সহজেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যাত্রী প্রত্যাখানের ইস্যুতে ৩২০০ টাকার জরিমানা ঠিক কীভাবে শ্রমজীবী চালকদের ন্যূনতম বাঁচার অধিকারটুকুকেও কেড়ে নেয়। আন্দোলনরত ট্যাক্সি-চালকেরা মূলত দুটি দাবী তুলে ধরেছেন:

১) জরিমানার সম্পূর্ণ বিলোপ অথবা সর্বোচ্চ ২০০ টাকা জরিমানা।

২) ভাড়া বৃদ্ধি।

আন্দোলন প্রসঙ্গে, ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে হাওড়ার এক ট্যাক্সিচালক বললেন, ''আমাদের অন্তত একটু সুস্থভাবে ট্যক্সিটা চালাতে দিক। আমাদের কথা কেউ ভাবেনা।'' তাঁর বক্তব্যে শুধুই হতাশা ছিলনা, ছিল ক্ষোভও; আর এই ক্ষোভ শুধুই কয়েকদিন আগে চাপানো 'নো রিফ্যুসাল' বা সেই সংক্রান্ত জরিমানার জন্য নয়, এর কারণ অনেক গভীর। বিগত তিন বছরে ডিজেলের দাম বেড়েছে প্রায় ১৫ টাকা প্রতি লিটারে। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে চাল-ডাল-তেল-নুন সহ বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য

জিনিসগুলোর দাম। অথচ ট্যাক্সির ভাড়ায় সেই অনুপাতে প্রায় কোনো প্রকার বৃদ্ধিই হয়নি। ফলে, ট্যাক্সিচালকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান খারাপ থেকে আরও খারাপ হয়েছে। খনিজ তেল এবং সেই সংক্রান্ত অর্থনীতি প্রতিদিন, প্রতিপদে দেশের পরিবহন শ্রমিকদের মুখের খাবার কেড়ে নিয়েছে। বিগত দু'দশক ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের পেট্রল-ডিজেলের দামের উপর বিনিয়ন্ত্রণ আমাদের সবারই চোখে পড়েছে। অবশ্য চোখ থেকেও যাঁরা দেখতে আগ্রহী নন, তাঁদের বিষয়টা আলাদা। ১৯৯১-এর পর থেকেই, দেশীয় তেল উৎপাদনে সরকারী বিনিয়োগ কমতে শুরু করেছে এবং আজ সেই বিনিয়োগের মান প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। আর সেখানেই উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, অতিস্বল্প রেভিনিউতে তেলের খনিগুলোকে বেসরকারী সংস্থাগুলোর হাতে তুলে দেওয়া। ফলে পেট্রল-ডিজেলের মূল্য নিয়ন্ত্রণের গোটা কর্তৃত্বটাই উঠে এসেছে, **আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির কারবারীদের হাতে**, যেকোনো শর্তে মুনাফা-ই যাদের একমাত্র লক্ষ্য। আর আমাদের দেশের সরকার, সেই কাজের আন্তরিক সহযোগীতার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছে যে সে আদতে কোন শ্রেণীর এজেন্ট! বিগত দেড় দশক ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অন্যতম কারণই হল খনিজ তেল। ইরাক-ইরান সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে মার্কিন হামলার উদ্দেশ্যই তো ছিল সেখানকার তৈলখনিগুলো দখল করে নেওয়া। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মালিকের দল ঠিক এভাবেই থাবা বসায়, আর তাতে পচে মরে সমাজের দরিদ্র অংশটা। তাই খনিজতেল তথা পেট্রল-ডিজেলের ইস্যুটা আর কোনওমতেই আমাদের দেশ বা ভারত সরকারের চৌহদ্দিতে আটকে নেই, বরং গোটা পৃথিবী জুড়েই তেল এবং সেই সংক্রান্ত অর্থনীতি ও রাজনীতি গরীব-মেহনতী-শ্রমজীবীদের একটা বড় অংশকে শোষণ করে চলেছে। আর তাই কলকাতা-হাওড়ার ট্যাক্সি-চালকদের এই আন্দোলন, শহর-রাজ্য-দেশের সীমানা ছাড়িয়ে, গোটা পৃথিবীর মেহনতী মানুষের মহান সংগ্রামের অংশীদার হয়ে পড়ে, যদিও এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা চোখে পড়ে, যখন এই ব্যাপক আন্দোলনের দিনগুলোর মাঝেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে মিছিলে ট্যাক্সিচালকদের অনুপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রকাশ পায়। চিৎপুর রোডের কাছাকাছি এক ট্যাক্সি-চালক বলছিলেন, ''দেশের সরকার গাড়ী চালাতে দিচ্ছে না। আর রাজ্য সরকার পেট চালাতে দিচ্ছেনা।'' প্রতি মাসে গড়ে যেমন ৫০ পয়সা প্রতি লিটারে ডিজেলের দাম বাড়ছে, তেমনই খাদ্যদ্রব্যের দাম হচ্ছে আকাশছোঁয়া। ২ টাকা কেজি দরে চালের যে দাবী কমিউনিস্টরা করেছিলেন দরিদ্র জনসাধারণের জন্য, আজ অব্দি তা আদায় করা সম্ভব হয়নি। এবং গোটা ব্যাপারটাতেই রাজ্য সরকার শুধুমাত্র নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষত বিগত তিন বছরে, যখন রাজ্যের সরকারে, আর বামপন্থীরা নেই, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে, রাজ্য সরকারে নিয়ন্ত্রনাধীন খাদ্যদ্রব্য সহ অধিকাংশ সামগ্রীতে ভর্তুকি হ্রাস পেয়েছে। আর ঠিক এভাবেই কেন্দ্র ও রাজ্যের শোষণের শাঁড়াশি-প্যাঁচে থেতলে গেছে এ রাজ্যের পরিবহন-শ্রমিকরা (অন্যান্য রাজ্যের চিত্র—ও কিন্তু কম-বেশী একইরকম)।

কেন্দ্রের ও রাজ্যের সরকার যখন এই সমাজের তামাম বিত্তশালীদের সুবিধার্থে, তাদের তথাকথিত 'আইনি' পদ্ধতিতে প্রায় সব রকমের মানুষ মারা নীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে দিয়েছে, তখনই 'আইনরক্ষক' পুলিশের তত্ত্বাবধানেও পরিবহন-শ্রমিকদের নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছে প্রতিদিন। মধ্য-কলকাতার এক ট্যাক্সি-চালক বললেন, ''কেস খাওয়াটা রেগুলার ব্যাপার। বিভিন্ন অজুহাতে পুলিশ তা দেয়; আর তখন 'ম্যানেজ' করতে ঘুষ দেওয়া ছাড়া উপায় থাকেনা।'' পুলিশি অত্যাচারের সবচেয়ে করুণ ঘটনাটা শুনেছিলাম বরানগরের এক ট্যাক্সিচালকের মুখে। বছর চল্লিশের ঐ চালক ডায়াবেটিস পেসেন্ট। এ.জে.সি বোস রোড দিয়ে যাওয়ার সময় একদিন রাস্তার ধারে গাড়ী দাঁড় করাতে বাধ্য হন সামনে একটি পাবলিক টয়লেট দেখতে পেয়ে। ২-৩ মিনিট পর যখন বেরিয়ে আসেন, উর্দিধারী পুলিশের উদার হাত ১৫০ টাকা ফাইন চায়, নো পার্কিং এরিয়ায় গাড়ী দাঁড় করানোর জন্য। ''বিশ্বাস করুন দাদা, পায়ে অব্দি পড়েছিলাম। বললাম পেচ্ছাপ ধরে রাখতে পারিনা আমি। শুনলো না, ৫০০ টাকার কেস দেওয়ার হুমকি দিল। সারা দিনে সে রকম প্যাসেঞ্জার জোটেনি সেদিন। বাধ্য হয়ে দিলাম দেড়শ টাকা। যেটুকু পড়েছিল হাতে সেটা দিতে হল মালিককে। বাড়ী ফিরলাম খালি হাতে। ভারাক্রান্ত স্বরে বলছিলেন ঐ চালক।

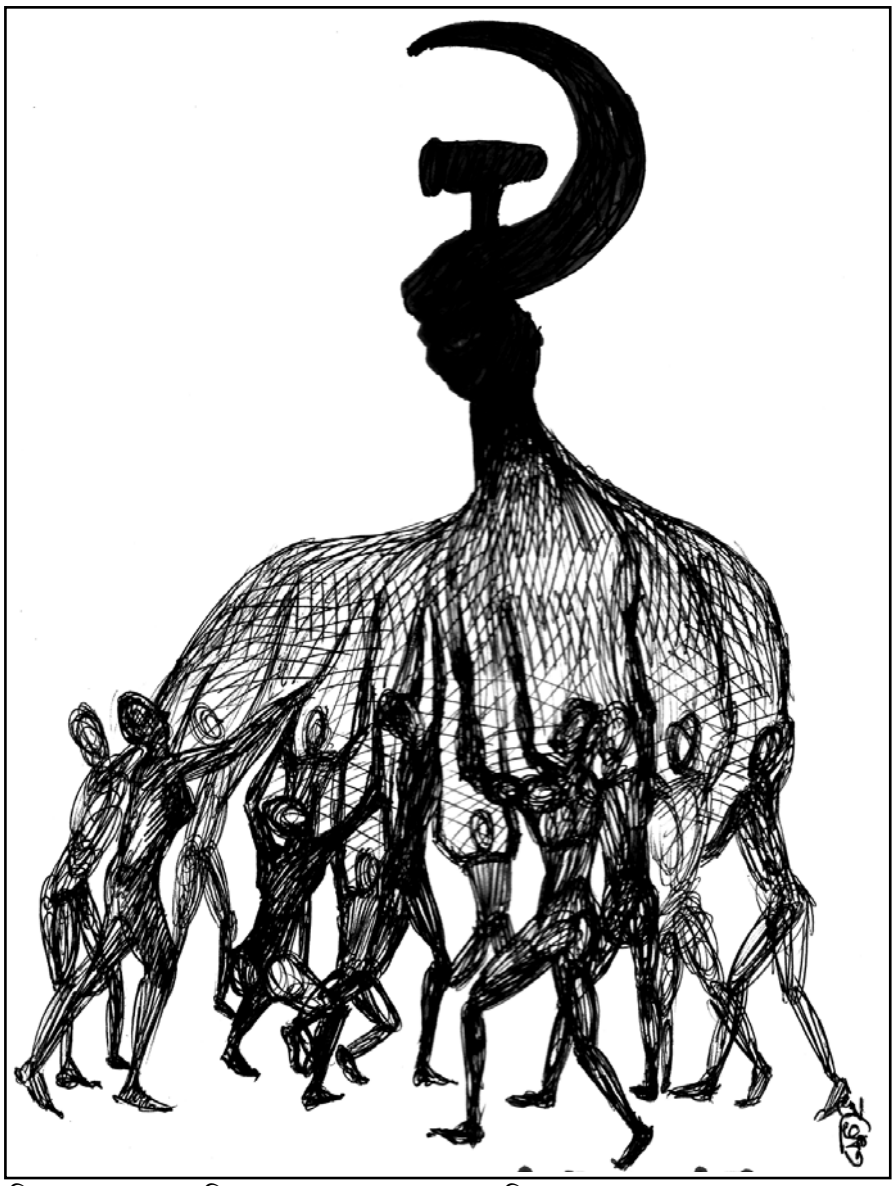

কথা বলতে গিয়ে আমরা জানতে চেয়েছিলাম চালকদের পরিবারের কথা। মাসের ২০-২২ দিন, প্রায় রোজ ১২-১৪ ঘণ্টার অমানবিক পরিশ্রমের পর যখন ঘরে ফেরেন, পরিবারের ছোটরা প্রায় সবই ঘুমে আচ্ছন্ন। আর পরের দিন সকালে যখন ঘর থেকে বেরোন, অবস্থাটা তখনও প্রায় এক। ''বেশীরভাগ দিনই ছেলে-মেয়েগুলো আধপেটা খেয়ে ঘুমোয়। খাবার জোটাতে পারিনা...'', বলছিলেন এক চালক, যিনি দুই সন্তানের বাবা-ও বটে। এখানেই এই সমাজের ভয়ঙ্করতম দ্বন্দটা স্পষ্ট হয় যখন আমরা দেখতে পাই, একদিকে কিছু পরিবারের ছেলেটা বা মেয়েটা বড় হয় অনাবিল প্রাচুর্যকে সঙ্গে করে, আর অন্যদিকে একদানা ভাতের আশায় হা-পিত্যেস করে গরীব-শ্রমজীবী পরিবারের ছেলেমেয়েগুলো।

শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ, সর্বত্র কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে বারবার-ই উঠে এল 'রিফ্যুসাল'-এর বিষয়টা। তাঁরা জানালেন যে, কোন পরিস্থিতিতে রিফ্যুস করতে বাধ্য হন যাত্রীদের। কতটা খারাপ অবস্থায় পড়তে হয়, যখন বেশী রাতের দিকে ফেরার পথে প্যাসেঞ্জার পাওয়া যায়না। হিসেব মত প্রতি কিলোমিটারে ৬টাকা ৩০ পয়সার তেল পোড়ে। তাই বেশী রাতে, পরিষেবা দিতে অনেকটা দুরে চলে গেলে, ফিরতি পথে ৮-১০ কিলোমিটার প্যাসেঞ্জার না পেলে লোকশানের পরিমানটা কতটা হয়, সহজেই তা হিসাবযোগ্য। ''এমনও একদিন হয়েছিল যেদিন বউ ফোন করে জানালো, ছেলেটার খুব জ্বর। ৮টা সাড়ে ৮টা বাজে তখন। হাতিবাগানের কাছে একজন স্প্ল্যানেড যেতে চাইল—বাধ্য হয়ে রিফ্যুস করলাম। লোকটা পুলিশ ডাকল। সবশুনেও পুলিশটা আমায় খিস্তি করে, জোর করে প্যাসেঞ্জার ওঠাল। এরা মানুষ নয়,'' বলছিলেন মধ্য কলকাতার এক চালক। তবে অবাক হয়েছিলাম যখন সমস্ত ড্রাইভারদের মুখেই একটা কমন বক্তব্য ছিল এই 'রিফ্যুসাল' নিয়ে।—''দাদা, আমরা মানুষকে হ্যারাস করতে চাইনা, আমরা চাইনা কাউকে বিপদে ফেলতে। আমরা তো পালবিককে সার্ভিস দেব বলেই আছি, দিতেও চাই। কিন্তু আমাদের কথাও একটু ভাবুক সরকার। নো রিফ্যুসালের টাইম বেঁধে দিক। নইলে ফাইনটা কমাক।'' রিফ্যুস করা যেখানে একজন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, যেখানে সরকার তাদের মাইনে দেয় না, সেখানে শুধুমাত্র সমাজের স্বার্থে, জনতার স্বার্থে সেই অধিকারের সাথেও আপোস করতে রাজী তাঁরা। তাঁরা আপোস করত রাজী সেই 'পাবলিক'-এর জন্য, যারা তাঁদের এমনকি মানুষ বলেও গণ্য করেনা, স্রেফ পরিষেবা দেওয়ার যন্ত্র হিসেবে ভাবে। তাঁরা আপোস করতে রাজী সেই মানুষগুলোর জন্য, যাদের কাছে তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার এই আন্দোলন, 'নাটকবাজি' বা 'নাকাল হওয়ার আরেকটা দিন' ছাড়া কিছুই নয়। যখন আমরা তাদের জানিয়েছিলাম রিফ্যুস করা তো আপনার ন্যায্য অধিকার, সেটা এভাবে স্যাক্রিফাইস কেন করবেন? উত্তরে খুব বেশী কিছু বলতে পারেননি, কেবল পুরোনো কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছিলেন মাত্র। শোষণকেই নিয়তি মেনে নেওয়া, সেই মানুষগুলোর কাঁধে যেন অদ্ভুত এক দায়িত্ব, মননে অদ্ভুত এক চেতনা। যে সমাজ তাদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুকেও প্রত্যাখান করে, সেই সমাজকে গতিশীল রাখার এক অনড় শপথ ছিল তাদের কথায়।

কথায় কথায় আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম, ট্যাক্সি-শ্রমিকদের সংগঠন প্রসঙ্গে। উত্তরে তাঁরা জানালেন সরকারের ক্ষমতা বদলের পর, মূলত তৃণমূল পরিচালিত শ্রমিক সংগঠনের কব্জায় চলে যায় তাঁদের ইউনিয়নগুলো। অতীতে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলো বিপদে-আপদে, সুবিধা-অসুবিধায় তাঁদের পাশে থাকতেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেন, উদ্বুদ্ধ করতেন লড়াই-সংগ্রামের জন্য। ক্ষেত্র-বিশেষ স্থান-বিশেষে কিছু বিচ্যুতি থাকলেও, মোটের উপর 'শ্রমিকের স্বার্থ' এবং 'ইউনিয়নের স্বার্থে' খুব বেশী ফারাক ছিলনা। আর এখন? পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। সরকারের চরম নিষ্পেষণ দেখা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র শাসকদল পরিচালিত সংগঠন হওয়ার জন্য, যেকোনো সরকার-বিরোধী আন্দোলন তাদের অবস্থান পশ্চাদমুখী। এইরকম সঙ্কটের মুহূর্তে যখন দরকার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের, শাসকদল পরিচালিত ইউনিয়ন তথা শ্রমিক সংগঠনগুলো সে সময় আন্দোলন বন্ধ করার 'ব্যবস্থা' নেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেনি। এক চালক আমাদের জানালেন, ''ওরা শুধু মাসে-মাসে ইউনিয়নের চাঁদা নিতে আসে। আর বছরে একবার ঘটা করে বিশ্বকর্মা পুজো করে।...সমাবেশ থাকলে, জোর-জবরদস্তি নিয়ে যায় মাঠ ভরাতে।''

শহর জুড়ে এক-দেড় মাস ধরে মূলত সি.আই.টি.ইউ ও এ.আই.টি.উ.সি সহ বিভিন্ন শ্রমিক-সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে যে বিশাল আন্দোলন চলছে, শহর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা, বিশাল অংশের মেহনতী চালকদের সবাই কি তার শরিক হতে পেরেছেন? কি ভাবছেন তাঁরা এই লড়াই নিয়ে? কি চাইছেন তাঁরা এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে? সারা শহর ব্যাপী যতজন ট্যাক্সিচালকের সাথে কথা হয়েছিল, প্রশ্নগুলো করেছিলাম আমরা। কোনো ভনিতা ছাড়াই উত্তরও এসেছিল—খুব সহজ-সরল এবং স্পষ্ট ভাষায়। হাওড়ার এক চালক বললেন, ''ফ্রিডম একদিনে আসেনি। আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না সরকার আমাদের দাবী মানছে।'' এই আন্দোলনের ভবিতব্য যাই হোক না কেন, সংগ্রামী হাতে, আর আশাভরা

মুখের, এই আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনই গোটা দেশের শ্রমজীবীদের বার্তা দেয় এক সংগ্রামী মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার। ইউনিয়ন তাদের চাপ দিয়েছে, বিক্ষোভে অংশগ্রহণ না করার। যদি করতেন, তাহলে? ''খোদ পরিবহনমন্ত্রী বলছে, 'পারমিট ক্যানসেল করে দেব'। ইউনিয়ন লিডারের কথা হল, আন্দোলনে গেলে কাল থেকে স্ট্যান্ডে দাঁড়াতে দেবনা। মনে-প্রাণে চেয়েও, যাওয়ার উপায় নেই। বোঝেন তো, পেটের দায়...''।

পেটের দায়েই যে সংগ্রাম, পেটের জন্য যে সংগ্রাম, যে সংগ্রাম নিজেদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুকে টিকিয়ে রাখার জন্য, পেটের দায়েই সেই সংগ্রামের অংশীদার হতে পারেননি চালকদের অনেকে। ''জানিনা দাদা, এই লড়াই আমাদের অধিকার পাইয়ে দেবে কিনা। তবু লড়াই তো বন্ধ করা যায়না। আমাদের আন্দোলন যেমন চলছিল, তেমনই চলবে।'' বললেন বরানগরের এক চালক। এত বাধা-বিপত্তি, চোখরাঙানি উপেক্ষা করে, সরকারের রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে মেহনতীর লাল-পতাকার কঠিন কঠোর বাস্তব, আজ তাই গোটা শহরকে দুলিয়ে দিয়েছে। যে সরকার 'আন্দোলন' করার অপরাধে 'পারমিট ক্যানসেল'-এর 'সাজা' দেওয়ার হুমকি দেয়, শহরের মেহনতী ট্যাক্সি-চালকেরা ক্ষমাহীন ঔদ্ধত্যে আজ তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে।

প্রতিদিনের চূড়ান্ত শোষণ, চূড়ান্ত অপমান আর দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে যাঁরা গড়ে ১২ ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে শ্রম দেন, সেই সমস্ত মেহনতী মানুষের 'স্বার্থে',/'মহান' ভারত সরকারের পার্লামেন্টে এই বিজেপি নেতৃত্বাধীন/ আগস্ট মাসেই একটি প্রস্তাব উঠে এসেছে বিল হিসেবে। যেখানে সারা পৃথিবীর বেশীরভাগ দেশের দিনে ৮ ঘণ্টার বেশী সময় ধরে শ্রমিককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে খাটানো দণ্ডনীয় অপরাধ, সেখানে আমাদের দেশে একজন শ্রমিকের, দৈনিক কাজের সময়ের কোনো সর্বোচ্চ সীমা না রাখার প্রস্তাব উঠেছে। এই জনবিরোধী নীতির মধ্যে দিয়ে গোটা মালিকশ্রেণী ও তার সরকার শ্রমশক্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন করবে, এ নিয়ে এতটুকুও সংশয় নেই। যদি ট্যাক্সি-চালকদের কথা ভাবি, তবে এই নীতি কার্যকর হলে তাঁরা পড়বেন দ্বিমুখী সমস্যায়। প্রথমত, দৈনন্দিন সর্বোচ্চ শ্রমদানের সময় আট ঘণ্টা হলে, একজন চালককে তার জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় মজুরী ঐ আট ঘণ্টা খেটেই অর্জন করতে হত। ফলে, মালিকদের মুনাফা, পেট্রল-ডিজেলের দাম ইত্যাদি মেটানোর পরে, তার হাতে ঐ পরিমান অর্থ থাকা উচিৎ। সেটা তখনই সম্ভব হয়, যখন মালিককে যা দিতে হবে, তার পাশাপাশি পেট্রল-ডিজেলের দাম হ্রাস পায়, এমনকি ট্যাক্সি-ভাড়াও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এগুলোর একটিও এখন আর হবে না, কেননা শ্রমদানের সময়ের কোনো উর্ধ্বসীমা রাখা হল না; ফলে মালিকশ্রেণী তার ইচ্ছানুসারে মুনাফা লুটবে আর চালকদের কোনও বিকল্প থাকবে না।

দ্বিতীয়ত, শ্রমদানের কোনো সর্বোচ্চ সীমা না থাকলে, 'রিফ্যুসাল'-এর ক্ষেত্রে, যে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার দাবী চালকেরা জানাচ্ছেন (নির্দিষ্ট 'ওয়ার্কিং আওয়ার'-এ 'নো রিফ্যুসাল')। সেটাকে ভেঙ্গে ফেলাটা খুব সহজ হবে। এখন শ্রমদানের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই, ফলে 'রিফ্যুস' করার ক্ষেত্রেও তা থাকবে না; গাড়ী রাস্তায় থাকলে যাত্রী তুলতে বাধ্য থাকবে চালক।

শ্রম সংক্রান্ত আইন ও বিধি নিয়ে যখন আমরা চালকদের সাথে কথা বলেছিলাম, বুঝেছিলাম এ বিষয়ে খুব একটা স্পষ্ট ধারণা তাঁদের নেই। শ্রমদানের যে একটা সর্বোচ্চ সময়সীমা থাকা বাঞ্ছনীয়, গোটা দুনিয়ার শ্রমশক্তির উৎসদের তা অজানা। তবে দু'একজনের কাছ থেকে মোটের উপর একটা উত্তর এসেছিল: ''আমরা তো খাটব বলেই আছি। মেহনত না করলে খাব কী? রেগুলার ১৪-১৫ ঘণ্টা না খাটলে পেট মানবে না।''

পেট মানবেই বা কী করে? যখন বেলাগাম শ্রম শোষণে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার পরেও সরকার ক্ষান্ত হয় না, বরঞ্চ পরিবেশ দূষণের অজুহাত দিয়ে পুরোনো গাড়ী বাতিল করে, নতুন গাড়ী কিনতে বাধ্য করায়, স্রেফ একচেটিয়া গাড়ী-বিক্রেতার মুনাফা বাড়বে বলে, তখন পেটের জ্বালা মেটাতে নিজের শরীরটাকে শ্রমদায়ী যন্ত্র বানানো ছাড়া উপায় থাকে না একজন চালকের। আর তারপর যখন মধ্যবিত্তের 'স্বল্পমূল্যে লাস্কারি' আর পুঁজিপতিদের জন্য 'মুনাফা' বাড়াতে, সেই পরিবেশরই ক্ষতি করে শহরে চালু হয় এ.সি বাস, তখন দিনে 'প্যাসেঞ্জারের অভাব' আর রাতে 'নো রিফ্যুসাল'-এর নাম করে পুলিশি জুলুমের কাছে নতজানু হতে বাধ্য হয় এই 'পেট'। এভাবেই প্রতি মুহূর্তে হাজারো সমস্যায় ফেলে চুষে খাওয়া হয় মেহনতী চালকের শ্রম। আর সরকার? তার ভূমিকা কেবলমাত্র এ সমাজের পুঁজিপতি শ্রেণীর অন্যতম পারিষদ হিসেবে—কখনও প্রকাশ্যে, কখনও বা গোপনে।

এই সমস্যার-ই প্রতিকার করতে মেহনতী চালকেরা নেমেছেন সঙ্গবদ্ধ আন্দোলনে। উত্তাল আন্দোলনে যখন গোটা শহর শ্রমজীবীদের স্লোগানে মুখর, তখন আমরা একবার বিশ্লেষণ করে দেখব এই সমস্যাগুলোকে, খুঁজতে চেষ্টা করব সম্ভাব্য সমাধানও।

সমাধান খুঁজতে গেলে, আমাদের ফিরে যেতে হবে সমস্যার উৎপত্তিস্থলে। গরীব, মেহনতী ট্যাক্সি-চালকের না বলার অধিকারের উপর জবরদস্তি 'না' চাপানোর অস্ত্র হিসেবে, সরকারী জরিমানা বর্তানোর নীতির প্রকৃত রাজনৈতিক বিশ্লেষণই এর একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রশ্ন উঠতেই পারে, এটি কী আদতে কোনো সমস্যা? না কি একটি স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক প্রক্রিয়ামাত্র?

আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে, রাষ্ট্র হল শ্রেণীসংগ্রামগত সাংঘাতকে দমন করার একটি যন্ত্রবিশেষ। এটি একটি কায়েমী শৃঙ্খলা ব্যতীত আর কিছুই নয়, যা 'উৎপীড়ক কর্তৃক নিপীড়িতের পীড়ন কে বিধিবদ্ধ করে।'[১] তাই সমাজের সেই অর্থনীতিগত মাতব্বর অংশ, যাদের স্বার্থরক্ষার্থে রাষ্ট্রের উদ্ভব, তাদের সম্পূর্ণ সাহায্যার্থে সে হাজারো ছুতোয়, হাজার-হাজার টাকার জরিমানা চাপিয়ে দেয়, হাজারো শ্রমজীবী মানুষের ওপর। তাই শোষণের এই প্রক্রিয়াটি যথেষ্টই স্বতঃস্ফূর্ত, কেননা এটি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্বের অনিবার্য বহিঃপ্রকাশমাত্র।

আন্দোলনরত ট্যক্সিচালকরা মূলত যে দুটি দাবী করেছেন, সে দুটি আরেকবার দেখা যাক্।

(ক) সরকারী ৩২০০ টাকা জরিমানা প্রত্যাহার অথবা সর্বোচ্চ ২০০ টাকার জরিমানা ধার্য করা।

(খ) ভাড়া বৃদ্ধি।

প্রথমটির স্বতঃস্ফূর্ততার একটি সাধারণ বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টির প্রসঙ্গে আসা যাক। উভয় দাবীর-ই বাস্তবায়ন অবশ্যই নির্ভর করছে আন্দোলনের প্রাবল্যের উপর। কিন্তু নুন্যতম ভাড়ার কিছুটা বাড়লেও কী চালকদের অবস্থার কোনও আমূল পরিবর্তন ঘটবে। প্রথমত, ট্যাক্সির সাথে পাল্লা দিয়ে বাজারে আসা স্বাচ্ছন্দময় এ.সি. বাস, আজ মধ্য ও উচ্চ-মধ্যবিত্তদের একটা বড় অংশের 'প্রেফারেন্স' হয়ে দাঁড়িয়েছে, স্বল্প খরচে অধিক দূরত্বে যাওয়ার ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয়ত, যাঁরা এ.সি বাচের খরচ পোষাতে পারবেন না, অথছ স্বল্প ভাড়ার কারনে মাঝেমধ্যে অন্তত 'সার্টল ট্যাক্সি' চড়েন, তাঁদের-ও একটা বড় অংশ আর ট্যাক্সি চড়তে আগ্রহ দেখাবে না হয়ত।

সারাদিনে একজন ট্যক্সিচালক যে বিপুল পরিমাণ শ্রমশক্তি ব্যয় করেন, তার এক দশমাংশেরও কম তিনি মজুরী হিসেবে পান। বাকিটার একটা বড় অংশ যাচ্ছে তেলের খরচে; উদ্বৃত্ত হিসেবে যেটুকু রইল, তার অর্ধেকই চলে যায়, বিভিন্ন কর, লাইসেন্স রিনুয়্যাল ইত্যাদি খাতে রাষ্ট্রের হাতে। অবশিষ্ট যে মুনাফা মালিকের কাছে থাকে, তার পরিমাণ ট্যাক্সিচালকের আয়ের তিন থেকে চারগুণ, কিন্তু কখনোই তার পরিমাণ খুব বেশি নয়। এখন ট্যাক্সি-পরিবহন সংক্রান্ত মজুরী-মুনাফার বাস্তব সমীকরণটা যদি এটাই হয় তবে তার বিশ্লেষণ কী?

পেট্রোপণ্যের দামের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের বিনিয়ন্ত্রণ, আদতে মেহনতী মানুষের উপর রাষ্ট্রীয় শোষণের নামান্তর মাত্র। তেলের খরচেই অধিকাংশ উদ্বৃত্ত মূল্য ব্যয়িত হওয়া, বাস্তবে কেবল ট্যাক্সি মালিকের মাধ্যমে চালকের শোষিত হওয়ার পরিবর্তে, একচেটিয়া মালিকের মাধ্যমে (মূলত খনিজ তেল বা গাড়ী সংস্থা ইত্যাদি) চালকের শোষণকে চিহ্নিত করে। এটি পুঁজিবাদী অর্থনীতির সেই দশা, যেখানে বড় বুর্জোয়ারা, **মূলত আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির কারবারীরা**, ছোট বা পেটি বুর্জোয়াদের শ্রম শোষণের 'সামাজিক অধিকার' (অধিকার-ই বটে, কেননা পুঁজিবাদী সমাজে শ্রম শোষণ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া) থেকে বঞ্চিত করে, শোষণের একচেটিয়াকরণের মধ্যে দিয়ে। ফলস্বরূপ, এমনকি ট্যাক্সি-মালিকেরাও আজ চালকের পাশে দাঁড়িয়ে একসাথে আন্দোলনে নেমেছেন।

এ নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে কি যে, পরিস্থিরি চাপে পড়ে আরোহী প্রত্যাখ্যান করাকে যতই ট্যাক্সি-চালকের 'অসহিষ্ণুতার নির্দশন' বলে চালানো হোক না কেন, বাস্তবে রাত সাড়ে এগারোটায়, ফিরতি গড়িয়াগামী হতদরিদ্র ট্যাক্সিচালককে ব্যারাকপুর না যেতে পারার অপরাধে, তিনহাজার টাকার জরিমানা করা তার থেকে অনেক বেশী অমানবিক? এই ব্যবস্থায় পুলিশের এফ.আই.আর, ডাক্তারের রোগী আর সরকারী বেতনভোগী বাবুর দায়িত্ব রিফিউসের 'অধিকার' থাকে, অথচ ট্যাক্সিচালকের ন্যায্য প্রত্যাখ্যানের অধিকারকে পিষে মারতে, পরোয়ানা জারি করতে একমুহূর্তও কালক্ষেপ করেনা বুর্জোয়া রাষ্ট্র।

গোটা শহরের ট্যাক্সিচালকেরা যখন ঐক্যবদ্ধ সরকারবিরোধী আন্দোলন চালাচ্ছিলেন, তখনই সরকারের পক্ষ থেকে এক অদ্ভুত অজুহাতকে সামনে রেখে জানানো হল বিরতির প্রস্তাব—'পুজো প্যাকেজ'। এই মনোরম প্যাকেজের আওতাভুক্ত, শহরের সমস্ত উচ্চ-মধ্যবিত্তেরা, নির্ঝঞ্ঝাটে 'দেবদর্শনের স্বাচ্ছন্দ' ভোগ করবেন আর সমাজপতিদের স্বার্থরক্ষার্থে বলি দিতে হবে মেহনতীদের গোটা আন্দোলনটাকেই—এই হল নতুন সরকারী পরোয়ানা। বহাল রইল সরকারী 'নো রিফ্যুসাল'-এর চাবুক, বহাল রইল ট্যাক্সিচালকদের দুর্দশা। এই প্রসঙ্গে আমরা যখন চালকদের সাথে কথা বলি, তাঁদের একজন বললেন, 'কি করব দাদা? আমরা গরীব মানুষ। ইউনিয়ন লিডাররা যদি কোনও স্টেপ না নেন, কীই বা করার থাকে...'। প্রসঙ্গত, ইনি শাসকদল পরিচালিত ইউনিয়নের 'অধীনস্থ'!!

এরপর একটা দীর্ঘ বিরতি। টানা একমাস ধরে গঙ্গার স্রোতে প্রায় সবধরনের ঈশ্বরত্বের বিলীনতার পর ২রা নভেম্বর উদয় হলেন রাজ্যের মাননীয় পরিবহনমন্ত্রী, মুখে নতুন প্রতিশ্রুতির বুলি নিয়ে। জানানো হল শাসকদলের ট্যাক্সিচালক ইউনিয়নের সাথে যুক্ত কিছু ট্যাক্সির জন্য ট্যাক্সি প্রতি ১০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। দেওয়া হবে আরও অনেক কিছুই, যদি মুখ বন্ধ করে রাখা যায়, যদি সমস্ত সরকারী জুলুমবাজিকে মেনে নেওয়া যায়। প্রচারিত হল সরকারের মহাননীতি, সমস্ত বাজারী আনন্দ দেওয়া পত্রিকাগুলোতেও, আর এভাবেই রাষ্ট্রশক্তির হল্লাবাজিতে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা হল মেহনতী মানুষের লড়াইয়ের ধ্বনিকে। সেঁটে দেওয়া হল 'নো রিফ্যুসাল'-এর লেবেল প্রায় অধিকাংশ ট্যাক্সিগুলোতেই।

এমন অবস্থায় আবারও সেই প্রশ্নটাই উত্থাপিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যা আগেও করেছি (হয়ত একটু অন্যভাবে) যে, ভাড়া বা মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য কী? 'অর্থনৈতিক সংগ্রাম শ্রমিকদের মনে, কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে সরকারী মনোভাবের উপলব্ধি জাগ্রত করে।... অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে কখনো আমরা শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে পারব না। কেননা, এ কাঠামো হল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ।'[২] মজুরীবিধির অস্তিত্ব, পুঁজীবাদী অর্থনীতির একটি বৈশিষ্ট্যমাত্র। তার স্থিতিস্থাপক ধর্মের কারণে, সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক আন্দোলনের প্রভাবে, মজুরীর কিছুটা বৃদ্ধি ঘটতে পারে ঠিকই, কিন্তু 'মজুর-মুনাফা'-র গোটা কাঠামোটা ভেঙ্গে পড়তে পারেনা। এখানেই অর্থনৈতিক সংগ্রামের তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতাটি নিহিত রয়েছে।

বাস্তবে পরিষেবাদাতা ও পরিষেবাভোগীদের (এক্ষেত্রে ট্যাক্সিচালক ও ট্যাক্সিআরোহী) মধ্যের দ্বন্দ্ব আসলে শ্রমিক ও মালিকের দ্বন্দ্ব তথা শ্রেণীসংঘাতে মীমংসার অসম্ভাব্যতার ফলমাত্র। মজুরীর অস্তিত্ব রয়েছে মানেই, মুনাফাও সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান, এবং তাই এই ব্যবস্থা কখনোই এমন কোনও পথ দর্শাতে পারে না, যা শ্রমজীবী মানুষকে শ্রমশোষণের হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করবে। এমন অবস্থায় যখন শত-সহস্র বছরের দাসত্ব-শৃঙ্খল প্রতি-মুহূর্তে আরও বেশী করে আষ্টেপৃষ্টে ধরে, তখন আর আলগা করে নয়, বরং সহস্র বছরের সহনশক্তি দ্বারা অর্জিত ক্ষমতাবলে শৃঙ্খলটাকেই ছিন্নভিন্ন করে বেরিয়ে আসার মধ্যে একমাত্র মুক্তির পথ সে খুঁজে পেতে পারে।

তবু সরকার আর মালিকশ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে পথে নামার শপথ নিয়ে, জাত-পাত-ধর্ম নির্বিশেষে খেটে-খাওয়া ট্যাক্সিচালকের লড়াই তার বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রামের অস্ত্রকে অবশ্যই শানিত করবে। রাষ্ট্র নতজানু হোক্ বা না হোক্, মুষ্টিবদ্ধ প্রত্যেকটা হাতের দাবী আতঙ্কের মত ছড়িয়ে পড়বে বিত্তশালীদের মনে। এই ব্যবস্থায় খেটে খাওয়াদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম, তাদের হক আদায়ের লড়াই, যে ঝাঁকুনিটা দেবে গোটা সিস্টেমকে, তাতে বুক তো কাঁপবেই লুটে খাওয়াদের। এই সংগ্রাম, তাদের চালাতে হবে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না অব্দি স্ফুলিঙ্গ পরিণত হয় অগ্ন্যুৎপাতে, যতক্ষণ না অব্দি এ দুনিয়ার তামাম পুঁজিপতিদের পশ্চাদ্দেশে পদাঘাত করে গোটা উৎপাদন ব্যবস্থার কর্তৃত্বটাই মজুরশ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের অধীনস্থ হয়।

কর্মহীন বিকাশের আষাঢ়ে গল্প : আমাদের জবাব

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

হয় আর যার উৎপাদন হয় না।

যেগুলি উৎপাদিত হয়, তাদের দাম নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা কখনই ধর্তব্যেও আনব না সেই সমস্ত কিছুকে যাদের 'পুনরুৎপাদন' হয় না, আর তাই অর্থনীতির সাথে তার দামের কোন সম্পর্ক নেই; যাদের দাম ওঠে কেবল আকস্মিকভাবে, যেমন কোন মহান ক্রিকেটারের রেকর্ড করা ব্যাট বা কোন স্বৈরাচারী শাসকের আঁকা তৈলচিত্র। এগুলির বিক্ষিপ্ততা ও আকস্মিকতার কারনেই জি.ডি.পি.-তে এদের কোন ভূমিকা থাকে না, এদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিলক্ষিত হয় কেবল সমাজের নানা বৃহৎ অপরাধমূলক কাজকর্মে পর্দা টানতে। যাই হোক, আজকের দিনে উৎপাদনে ও উৎপাদিত পণ্যের বাণিজ্যে যে বিনিয়োগ হয়, তার একটা বড় অংশ ব্যাঙ্ক বা বিভিন্ন ফিন্যান্স সেক্টর থেকে লোন নিয়ে খাটানো হয়।[১] আবার পণ্যের বাণিজ্যের মধ্যে পরিবহন এবং অ্যাডভার্টাইসমেন্ট[২] দুটি পৃথক শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্র, এবং স্টোরেজ সিস্টেম[৩]-এরও নিজস্ব খরচ আছে। পণ্যগুলির মোট দাম নির্ধারণ করা হয় এই সমস্ত বিনিয়োগ ব্যয়-এর ওপর সুদের হার (যা শোধ করতে হবে) যোগ গড়পরতা মুনাফার হার অনুযায়ী একটা বাড়তি ধরে নিয়ে। পণ্যগুলো আদৌ বিক্রি হবে কিনা, বা সমস্ত পণ্য বিক্রি হয়ে যাবে কিনা (আর বাস্তবে তা হয়ও না), তার সাথে এই দাম নির্ধারণের কোন সম্পর্ক নেই। বিক্রির বিষয়টা নির্ভর করে বাস্তব সমাজে ক্রয়ক্ষমতা (বুর্জোয়াদের প্রচারিত ভাষায় 'চাহিদা') ও জোগানের ভারসাম্যের ওপর। যেভাবে বুর্জোয়া তাত্ত্বিক ও তাদের স্তাবকেরা প্রচার করে থাকে, তেমনভাবে 'চাহিদা' ও জোগানের ওপর ভিত্তি করে কখনও উৎপাদন-দাম নির্ধারিত হয় না, 'দাম'-এর ট্যাগ ছাপা হয়ে যায় বিক্রির বহু পূর্বেই। আর সেজন্যই চৈত্র সেল বা পুজো সেল-এ কতো '%' ছাড় হবে, তার সাথে সারা বছরের 'প্রাইস ট্যাগ'-এর কোন সম্পর্ক থাকে না। জি.ডি.পি. প্রকাশ করে মোট 'উৎপাদন-দাম'-কে, তার মধ্যে কতো দামের জিনিস বিক্রি হল, তার পরিমানকে নয়।

কিন্তু যখন সুদ আর মুনাফার গড়-পরতা হার অনুযায়ী বাড়তি ধরে নিয়েই 'দাম' নির্ধারণ করে পুঁজিপতিরা, সেক্ষেত্রে তারা তো নিজেরাই আলোচনা করে যতো খুশি মুনাফা ও সুদের হার বাড়িয়ে নিতে পারে, আর সেই অনুযায়ী পণ্যের দামও, কারণ তাদের চাহিদা সর্বদাই মুনাফা বাড়ানো,—আরো বাড়ানো; কিন্তু তা তো হয় না! এখানে কেউ মনে করতে পারেন যে যেমন-তেমন দাম বাড়ালে পণ্য বিক্রি হবে না। প্রথমত, সে বিষয়ে আগেই বলা হয়েছে যে নানা ধরনের 'সেল' দিয়েও সমস্ত পণ্য ওরা বেচতে পারে না এবং এর সাথে এই দাম নির্ধারণের সম্পর্ক নেই; দ্বিতীয়তঃ, পরে আমরা দেখাব যে এযুগের উৎপাদনের প্রবণতাই বেশি দামী পণ্য তৈরী। তাহলে কী তা, যা তাদের টেনে ধরে সুদ আর মুনাফার গড়পরতা হারের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমায় এবং বাধ্য করে প্রতিটা পণ্যকে একটা 'MRP' (ম্যাক্সিমাম রিটেল প্রাইস, অর্থাৎ সর্বাধিক যত দামে বিক্রি করা যাবে)-তে আটকে যেতে? আসলে এটা বস্তুজগতের সংরক্ষণসূত্র যে, যেকোনো নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় মোট 'ইনপুট' যতোটা, 'আউটপুট' কখনো তার থেকে বেশি হতে পারেনা। সুতরাং পণ্যের দামের 'MRP'-তে আটকে যাওয়ার কারণও তার উৎপাদন প্রক্রিয়ার বস্তুগত 'ইনপুট'-এর নির্দিষ্ট পরিমাণ। কী এই উৎপাদনের বস্তুগত 'ইনপুট'?—'শ্রম', —কেবল মানবশ্রম, যা সমস্ত পণ্যের উৎপাদনেরই এক ও অভিন্ন বস্তুগত 'ইনপুট', যদিও বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে তার পরিমাণ হয় বিভিন্ন, যা সাধারণভাবে মাপা হয় 'শ্রমসময়'-এর এককে, যেমন শ্রমদিবস-এ। সেজন্য একটা পুঁজির চলাচলের সীমানা যতোটা উৎপাদনক্ষেত্র সমূহ পর্যন্ত বিস্তৃত, সেই সমগ্র উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মোট যত শ্রমদিবস ব্যয়িত হয়েছে তার সমতূল্য 'অর্থ' হল ঐ সমস্ত পণ্যের মোট 'MRP'। এখন এক-একটা পণ্য বা তার অংশ তৈরীতে কতোটা শ্রম বা শ্রমসময় লেগেছে, তা জানা-বোঝা-মাপার আয়ত্তে না থাকলেও, সমস্ত পণ্য তৈরীতে কতো শ্রম বা শ্রম-সময় লেগেছে, অর্থাৎ বছরের মোট শ্রমদিবস জানা।#

এখন প্রশ্ন আসে, যেগুলি উৎপাদিত তথা পুনরুৎপাদিত হয় না, কিন্তু যাদের দাম ঢুকে পড়ে জি.ডি.পি.-র মধ্যে, যেমন জমি, জলাশয়, তরঙ্গ বা কোন বিশেষ টেকনোলজি, তাদের দাম নির্ধারিত হয় কিভাবে?* মনে রাখতে হবে এগুলি প্রত্যেকটিই কোন না কোন উৎপাদনের উপায় এবং সেজন্যই উৎপাদন দামের মধ্যে এদের দামও আত্মপ্রকাশ করে, এবং তা করে কেবল এবং কেবল মালিকানা তথা 'দখলদারি'-র জোরে, সে দখলদারি ব্যক্তিগত হোক বা গোষ্ঠীগত হোক, বা এমনকি রাষ্ট্রীয়। টেকনোলজির ক্ষেত্রে একে পেটেন্ট বলা হয় এবং 'কপিরাইট'-এর মাধমে এ দখলদারি প্রতিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে**। এগুলির নিজস্ব উৎপাদনশীলতা (যেমন কৃষিজমির ক্ষেত্রে উর্বরতা, নির্মাণ শিল্পের জমির ক্ষেত্রে ধারণক্ষমতা, জলপ্রপাতের স্রোতের বেগ, টেকনোলজির নিজস্ব বিশেষত্ব ইত্যাদি)-র দরুণ যতটা বাড়তি উৎপাদন হয়, তথা বাড়তি উৎপাদন-দাম সৃষ্টি হয় একই পরিমাণ শ্রমের খরচে, ততোটাই বার্ষিক খাজনা, বা লিজ-এর টাকা, বা কপিরাইট-এর চার্জ বা সরকারী ক্ষেত্রে রেভিনিউ দিতে হয়। অর্থাৎ শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের দামের একটা অংশ এগুলোর মালিকেরা পায় উৎপাদনে একটা টাকাও খরচ না করেই, কেবল মালিকানা তথা দখলদারির জোরেই। ফলে 'প্রাপ্য' এই টাকাকে ব্যাঙ্ক বা কোন ফিন্যান্স সেক্টরে রাখা মূলধনের থেকে পাওয়া সুদেরই সমতূল্য বলেই মনে হয়; স্বাভাবিকভাবেই সেই কাল্পনিক মূলধনেরই সমান ধরা হয় এদের দাম, বা প্রচলিত ভাষায় 'অ্যাসেট ভ্যালু'। ব্যাঙ্কে রাখা একটা মূলধনের থেকে এর পার্থক্য কেবল এই যে, উৎপাদনের উপায়ের এই নিজস্ব উৎপাদনশীলতা, যার দরুণ তৈরী হচ্ছে এর 'দাম', তা উৎপাদনে ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে বাড়তে পারে বা কমতে পারে বারংবার উৎপাদন চলতে চলতে, প্রকৃতপক্ষেই বা আপাতভাবে অন্যান্যদের তুলনায়# এবং তা বাড়তে বা কমতে পারে এই প্রাপ্ত বাড়তি-দামটার উৎপাদনে কোন পুনর্নিয়োগ ছাড়াই। সুতরাং সমস্ত কিছুর 'দাম', তা উৎপাদিত তথা পুনরুৎপাদিত হোক আর না হোক, সৃষ্টি হয় উৎপাদনে ব্যয় করা 'মানবশ্রম' থেকে, কেবল 'মানবশ্রম' থেকেই।

।। দুই।।

একটা পুঁজিবাদী সমাজে, মোট উৎপাদন দাম আসলে এই পুঁজির চলাচলের সীমানাক্ষেত্রের মধ্যে উৎপাদিত সমস্ত পণ্যের জন্য ব্যয়িত মোট মানবশ্রমের দাম; যদিও এই 'অর্থ' বিভক্ত হয় মূলত তিন ভাগে,—এক, শ্রমিক একটা অংশ পায় (কারখানায় বা অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে বা অন্যের জমিতে চাষের জন্য মজুরী হিসাবে, অথবা নিজের জমিতে চাষের ক্ষেত্রে বা স্বনিযুক্ত শ্রমিক হলে পন্য বিক্রির দাম হিসাবে); দুই, উৎপাদনের সেই সব উপায় যার উৎপাদন বা পুনরুৎপাদন হয় না তার মালিকেরা (ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র) খাজনা বা লিজ বা কপিরাইট চার্জ বা রেভিনিউ হিসাবে পায় একটা অংশ; আর তিন, বিনিয়োগের খরচ পোষানার পর পুঁজিপতির ভাগে আসে বাকি অংশ, মোট মুনাফা, যার একটা অংশ ট্যাক্স হিসাবে তারা দেয় রাষ্ট্রকে এ-ব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখার যাবতীয় বন্দোবস্তের জন্য (যা থেকে প্রশাসনিক, সামরিক এবং অফিস-কাছারি-শিক্ষা-স্বাস্থ্য এসবের সমস্ত খরচ চলে), আর বাকিটা পুঁজিপতিদের প্রফিট (প্রফিট আফটার ট্যাক্স) এবং ফিন্যান্স কারবারের সুদ। অর্থাৎ সমস্ত অর্থই শ্রমিকেরই সৃষ্টি হলেও সে পায় কেবল তার একটা অংশ মাত্র, আর বাকীটা যায় পুঁজিপতি, ফিন্যান্স কারবারী, বিভিন্ন মালিক এবং প্রশাসনিক-সামরিক-পরিষেবা ক্ষেত্রে কর্মরতদের হাতে। এ তো গেল মোট উৎপাদন দামের তিনটে মূল শিবিরে বিভাজন; কিন্তু বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রগুলোর মধ্যে এই মোট উৎপাদন দাম কীভাবে বিভাজিত হয়? আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, এক-একটা পণ্য উৎপাদনক্ষেত্রে কত-কত শ্রম ব্যয় হয়েছে তার পাই-পাই হিসাব সম্ভব নয়, কারণ গণনার মধ্যে থাকে কেবল বছরের মোট শ্রমদিবস, তাই এক-একটা পণ্যের দাম তার উৎপাদনে বিনিয়োগ ও গড়পরতা হারে ধরে নেওয়া মোট মুনাফার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। সরলভাবে ধারণাটা এরকম—"যতো বেশি বিনিয়োগ, ততো বেশি লাভ।" দাম নির্ধারণের আর কোন মানদণ্ড এই উৎপাদন ব্যবস্থায় নেইও। সুতরাং সমস্ত পণ্যের মোট দাম (MRP) তাদের উৎপাদনে মোট যতো শ্রম ব্যয় হয়েছে তার দামের সমান হলেও এক-একটা পণ্যের দাম (বিনিয়োগের আনুপাতিক হারে) তার উৎপাদনে যতো শ্রম লেগেছে তার থেকে বেশি বা কম হয় (যাতে সামগ্রিকভাবে তা কাটাকাটি হয়ে যায়)[৪]। ফলে একজন শ্রমিকের উদ্বৃত্ত কেবল তার মালিকের মুনাফা এবং খাজনা সৃষ্টি করে, এমনটা আদৌ নয়। পুঁজিবাদী সমাজে সমস্ত শ্রমিকের মোট উদ্বৃত্ত সৃষ্টি ক'রে চলে সমস্ত মালিকের মোট মুনাফা-খাজনা এবং অন্যান্য উদ্বৃত্তভোগী কর্মীদের মাইনেও, আর এভাবেই 'গোটা সমাজ ক্রমেই বেশি পরিমাণে ভাগ হয়ে পড়ছে সরাসরি পরস্পরের সম্মুখীন দুটি বিশাল শত্রু শিবিরে" (কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, মার্কস্ ও এঙ্গেল্স্)।#

যদিও সমস্ত পণ্যের মোট দাম মোট শ্রমের দামের সমান, কিন্তু যে পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ হয়েছে বেশি, গড় মুনাফার হার অনুযায়ী তার দাম হয় তার উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমের থেকে বেশি; এবং বিপরীতক্রমে কম বিনিয়োগ হয়েছে এমন পণ্যের দাম তার উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমের থেকে কম হয়। ফলে উদ্বৃত্ত শ্রমের মূল্য ছোট বিনিয়োগ থেকে স্থানান্তরিত হয় বড় বিনিয়োগ ক্ষেত্রের মুনাফায়। যে পণ্যের উৎপাদনে বিনিয়োগ বেশি সেখানে শ্রম কম লাগলেও দাম বেশি হয়, অন্যদিকে যেখানে বিনিয়োগ কম, সেখানে বিপুল শ্রমের পরেও পণ্যের দাম বাড়িয়ে তোলা যায় না। আর এভাবেই উৎপাদন তথা উৎপাদন-দাম ভাগ হয়ে যায় দুই শত্রুতামূলক শিবিরে—পুঁজিনিবিড় আর শ্রমনিবিড়। এখন পুঁজিই শোষণ করে শ্রমকে, কেবল তা-ই নয়, পুঁজিবাদের আওতায় পুঁজিনিবিড় পুঁজি শোষণ করে শ্রমনিবিড় শ্রমকেও—বৃহদায়তন শিল্প শোষণ করে ক্ষুদ্র শিল্পকে, সামগ্রিকভাবে শিল্প শোষণ করে কৃষিকে

---

১. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার তথ্য অনুযায়ী ভারতের বেসরকারি শিল্প-পরিষেবা ক্ষেত্রের সামগ্রিক লোন বৃদ্ধির হার ২০১২-১৩ সালে ১৪.৭%।

২. 'গ্রুন্ডিসে'-তে মার্ক্স বিশ্লেষণ করেন, "উৎপাদন শুধুমাত্র প্রয়োজন মেটানোর জন্য বস্তুর জোগান দেয় না, বস্তুর জন্য প্রয়োজনেরও জোগান দেয়।...ভোগের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি বস্তুর সম্পর্কে ধারণার ভিত্তিতেই তৈরী হয়। ...ফলে উৎপাদন শুধুমাত্র বিষয়ীর জন্য বিষয়ের সৃষ্টি করে না, বিষয়ের জন্য বিষয়ীও সৃষ্টি করে।" আজকের দিনে অ্যাডভার্টাইসমেন্ট-এর মাধ্যম ক্রেতা তৈরীর বাহুল্য এ বক্তব্য দিয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা যায়।

৩. স্টোরেজ সিস্টেমও আজ হয়ে উঠছে একটা ধনতান্ত্রিক উৎপাদনক্ষেত্র যখন শপিং মলগুলো বেড়ে চলেছে গুণিতক হারে। 'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে মার্কস দেখান, "সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে, তারা হতে পারে কেবল ব্যয়, জীবন্ত বা বাস্তবায়িত শ্রমের অনুৎপাদনশীল ব্যয়, কিন্তু ঠিক সেই কারনেই তারা ব্যক্তি পুঁজিপতির পক্ষে হতে পারে মূল্য-উৎপাদনশীল, তার পণ্যের বিক্রয় দামে হতে পারে একটি সংযোজন" এবং তিনি উল্লেখ করেন "সমস্ত শ্রম, যা মূল্য যোগ করে, তা উদ্বৃত্ত মূল্যও যোগ করতে পারে এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রণালীতে সবসময়েই উদ্বৃত্ত মূল্য যোগ করবে।" এভাবেই শপিং মলের কর্মীরাও হয়ে উঠছেন উদ্বৃত্ত সৃষ্টিকারী শ্রমিক।

\# ধরা যাক, একটি শ্রমদিবসের সমতূল্য 'অর্থ' ধরা হয়েছে ১০০০ টাকার সমান। এখন বছরের মোট শ্রমদিবস যদি হয় ১০ কোটি, আর সমস্ত পণ্যের মোট MRP নির্ধারণ করা হয়ে থাকে ১০,০০০ কোটি (মোট শ্রমের সমতূল্য 'অর্থ') টাকার বেশি, তাহলে টাকার দাম কমে যাবে (এবং বিপরীত ক্ষেত্রে বেড়ে যাবে) এবং যদি বাস্তবেই এইরকম পণ্য বিক্রির অবস্থা তৈরী হয় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের তরফ থেকে বাজার থেকে মুদ্রা তুলে নিয়ে বা বাজারে মুদ্রা ছেড়ে সমস্যার সমাধান করা হয়।

* জমি বা তরঙ্গের দামের থেকে খনি বা গ্যাস বেসিনের দাম গুণগতভাবে আলাদা, কারণ প্রথম দুটি উৎপাদিত বা পুনরুৎপাদিত হয় না, কিন্তু দ্বিতীয় দুটি খনিজ পদার্থের উৎস এবং মোট যতো খনিজ পদার্থ সেখান থেকে পাওয়া যেতে পারে তার উৎপাদন দামই এদের দাম, ফলে এদের ক্ষেত্রে দাম নির্ধারণ হবে প্রথম উপায়ে। উল্লেখ্য যে সূর্যের আলোরও দাম তৈরী হতে পারে এবং বড়ো বড়ো সোলার প্রজেক্ট তৈরীর পরে তা হবেও; কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সূর্যের জেনিদ্ কোন আলাদা হওয়ার কারণে রশ্মির তীব্রতা আলাদা, যা ভিন্ন ধরনের উৎপাদনশীলতা তৈরী করবে। সেক্ষেত্রে সূর্যালোকের দাম নির্ধারিত হবে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে।

** এধরনের কপিরাইট-এর জন্য বিগত দশকে কয়েকটি দেশে খরচের বৃদ্ধির পরিমাণ (কোটি ডলার-এ):

	ব্রাজিল	রাশিয়া	ভারত	চীন	ইউ.এস.	ইউ.কে.	ফ্রান্স	জার্মানি
২০০৫	১৪০.৪	১৫৩.৩	৬৭.২	৫৩২.১	২৫৫৭.৭	৯৪৬.৩	৩০৯.৪	৮৪৯.৭
২০১২	৩৬৬.৬	৭৬২.৯	৩৯৯.০	১৭৭৪.৯	৩৯৮৮.৯	৮৪১.৩	৯৫৭.৪	১২২৪.৩
পরিবর্তন(%)	১৬১	৩৯৮	৪৯৪	২৩৪	৫৬	-১১	২০৯	৪৪

\# \# যেমন জমির উর্বরতা বৃদ্ধি বা হ্রাস-এর বিষয়টা স্বতঃস্পষ্ট, টেকনোলজির ক্ষেত্রে তা সম্ভব উৎপাদনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তার মডিফিকেশন করলে বা উল্টোদিকে অন্য কোন আরও উন্নত টেকনোলজি আবিষ্কৃত হলে।

৪. এভাবেই 'ক্যাপিটাল'-এর ৩য় খণ্ডে মার্কস 'মূল্য' ও 'দাম'কে পৃথক করেন।

\# উদ্বৃত্তভোগী মধ্যশ্রেণীগুলো দুই শিবিরের মাঝে দোলাচলে থাকে, কিন্তু পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথে তারা প্রায় স্থায়ী শিবির বেছে নিতে থাকে। কীসের ভিত্তিতে এদের প্রবণতা সৃষ্টি হয়,তা-ও আমরা দেখাব।

এবং সাম্রাজ্যবাদী জাতিগোষ্ঠী সমূহ শোষণ করে অনুন্নত ও উন্নয়শীল দেশকে। এর মানে অবশ্য এইটা নয় যে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি শোষণ করে জাতীয় পুঁজিকে, যেমন এইটাও নয় যে বড় মালিকেরা শোষণ করে ছোট মালিকদের (কারণ মালিককে শোষণ করবার কিছুই নেই, উৎপাদনে তথা উৎপাদনের দাম সৃষ্টিতে তার গতরের কোন ভূমিকাই নেই, যতটা বুদ্ধির খরচ বা দৌড়াদৌড়ি সে করেছে, তা সে করেছে কেবল তার লাভ তোলবার জন্য, কাঁচামালগুলোকে নতুন একটা দ্রব্যে রূপান্তরিত করবার জন্য নয়)। ফলতঃ এর মানে কেবল এইটাই যে, পুঁজিনিবিড় পুঁজি এখন তার নিজের জন্য উৎসর্গীকৃত শ্রমের থেকে শ্রমনিবিড় শ্রমকে শোষণ করে বেশি, অনেক বেশি, সেই উৎপাদনে সরাসরি প্রবেশ না করেই; এবং এভাবেই দেশ নির্বিশেষে পুঁজির অবাধ চলাচলের যুগে (বর্তমান বিশ্বায়ন পর্বে) সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে অনেক কম পরিমাণে প্রবেশ করেও তার শ্রমকে শোষণ করে অনেক বেশি পরিমাণে।[৫] এবং এ থেকে স্পষ্ট হয় কেবল এইটাই যে, যেহেতু উন্নত টেকনোলজিতে বিনিয়োগ অনেক বেশি, তা পুঁজিনিবিড়, এবং ফলে যে ব্যাপক মুনাফা তারা অর্জন করে, তা অন্যান্য শ্রমনিবিড় ক্ষেত্রগুলোর উদ্বৃত্ত থেকেই; অর্থাৎ মানবশ্রমকে ব্যাপকভাবে শোষণ করেই, মানবশ্রম হটিয়ে দিয়ে নয়।

অতএব, নিজের জমিতে চাষ করে এমন কৃষক বা স্বনিযুক্ত শ্রমিক, বিনিয়োগ কম বলেই, পণ্য বিক্রি ক'রে তার নিজের ব্যয়িত শ্রমের মূল্যও ফেরৎ পায় না, তার উদ্বৃত্ত শ্রমের মূল্য স্থানান্তরিত হয় বৃহৎ বিনিয়োগের মুনাফায়, এবং এভাবেই সে এই ব্যবস্থায় হয়ে ওঠে একজন মজুরি শ্রমিকের মতোই উদ্বৃত্ত সৃষ্টিকারী শ্রমিক। অন্যদিকে মজুরি শ্রমিক, যে মালিকের সাথে এগ্রিমেন্ট করে কতো ঘণ্টা খেটে কতো মজুরি নেবে এবং তার মধ্যে দিয়ে মালিককে বিক্রি করে প্রতিদিন ততো ঘণ্টা খাটবার ক্ষমতা (মার্কস যাকে 'ক্যাপিটাল'-এর ১ম খণ্ডে ব্যাখ্যা করেন 'শ্রমশক্তি' হিসাবে), তার এই 'শ্রমশক্তি' নিজেই হয়ে উঠেছে একটা পণ্য, তার 'দাম' অর্থাৎ 'মজুরি'-ও এখন নির্ধারিত হয় বিনিয়োগের হিসাবেই। 'দক্ষ' শ্রমিকের মাইনে যে আজ হয়ে দাঁড়ায় 'অদক্ষ' লেবারের মজুরির চেয়ে অনেক বেশি, তা কোন দক্ষতার কারণে আদৌ নয়, বরং ঐ দক্ষতার ডিগ্রি পেতে তাকে বিনিয়োগ করতে হয়েছে ঢের বেশি (পড়াশুনা শিখে বা কোর্স করে যা অর্জিত, তার জন্য যা খরচ হয়েছে, টাকায় বা তার সমতুল্য সময়ে, তাকে দেখা হয় একটা বিনিয়োগ হিসাবেই), সেই জন্যই। বড় বড় কারখানার সুশিক্ষিত সুইচ টেপা 'দক্ষ' শ্রমিকের দক্ষতা নিয়ে যাঁরাই বড়াই করুন না কেন, তার শ্রমশক্তির খরচ অনেক কম এবং দক্ষতাও; আর সেটা নির্লজ্জভাবে আত্মপ্রকাশ করে উৎপাদন চলাকালীন মেশিনপত্র বন্ধ হলে বা তার কোন পার্টস খারাপ হলে, যখন 'অদক্ষ' লেবারেরা অবতীর্ণ হয় উদ্ধারকার্যে, নিজের ব্যাপক খাটুনির বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জ্ঞান নিয়ে। এইসব সুইচ টেপা 'দক্ষ' শ্রমিকেরা অধিকাংশ বৃহদায়তন শিল্পে কোন উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরী তো করেই না (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা পালন করে উৎপাদনে ম্যানেজারের ভূমিকা), উল্টে 'অদক্ষ' শ্রমিকদের উদ্বৃত্তভোগী আর সেজন্যই দিকে দিকে তাদের বুর্জোয়া বনে যাওয়ায় আশ্চর্যের কিছু নেই।[৬] অন্যদিকে প্রকৃত 'দক্ষতা' সম্পন্ন শ্রমিকেরা, যা অর্জনের জন্য তারা প্রায় কিছুই বিনিয়োগ করেনি, উদাহরণ স্বরূপ গাড়ির চালক বা চা-পাতা তোলেন যে শ্রমিকেরা, বা কাপড়ের ওপর সূক্ষ্ম সুতোর কাজ করেন ইত্যাদি, তাদের মজুরি আজও তাদের ক্ষুধা মেটানোর জন্যও যথেষ্ট হয় না। বিষয়টা আরও স্পষ্ট হবে যদি তুলনা করেন বাড়িতে রান্না করে এমন গার্হস্থ্য শ্রমিকের সাথে কোর্স করা একজন 'শেফ'-এর আয়ের।

এখন বোধ হয় স্পষ্ট 'কর্মহীন বিকাশ'-এর হই হই রই রই-এর আসল নির্যাসটা। জি.ডি.পি. বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু পড়াশুনো শিখে বেকার হয়ে বসে আছে, 'সম্মানজনক' কাজ পাচ্ছে না, সুতরাং 'কর্মহীন বিকাশ'। অথচ অসংখ্য মানুষ যে প্রতিদিন নানা ক্ষেত্রে, কারখানার ক্যাসুয়াল থেকে ঘরে ঘরে অর্ডারি, ট্রান্সপোর্ট থেকে মাল বওয়া, ক্ষেতমজুরি থেকে ইঁটভাটা বা কৃষি থেকে স্বনিযুক্তি, লাগাতার খেটে আর খাটুনির দাম না পেয়ে উদ্বৃত্ত তৈরী করে চলেছে, আর সেই উদ্বৃত্তই বড় বড় বিনিয়োগের বড় বড় মুনাফায়, অ্যাসেট ভ্যালুতে, ব্যাঙ্ক আর ফিন্যান্স সেক্টরের সুদে এবং প্রশাসনিক-সামরিক-পরিষেবা ক্ষেত্রের মাইনেতে রূপান্তরিত হয়ে জি.ডি.পি. বাড়িয়ে চলেছে, তা মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি স্বীকার করে কোন যুক্তিতে! তার কাছে প্রশ্নটা বরং এই যে, ''মধ্যবিত্তরা একটা মধ্যবিত্ত স্বরূপ বিনিয়োগ করে তাদের পরিবারের সন্তানকে সুইচ টেপা 'দক্ষ' শ্রমিক তৈরী করেছে, তা কি চাষ করে না খেতে পেয়ে মরার জন্য, না লেবারের মতো 'লো-স্ট্যান্ডার্ড'-এ বাঁচার জন্য! তার বিনিয়োগের দাম পেতে চাই সুইচ টেপা শিল্প, চাই বড় বিনিয়োগ।'' যে টেকনোলজী মানবশ্রম হটাচ্ছে বলে তারা দাবী করে, হিড়িক তোলে কর্মহীন বিকাশের, অবশেষে সে ধরনের শিল্প এনেই কর্মসংস্থান হবে বলে প্রচার চালায়। আর এভাবেই পুঁজিবাদের বিরোধিতার নামে বড় বড় পুঁজিপতির চরণতলেই তারা আশ্রয় নেয়।

।। তিন।।

শ্রমকে হটিয়ে দিয়ে মুনাফা অর্জনের যে তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছে তার ভিত্তিস্বরূপ একটা বড় সংযোজন ফাটকা কারবার। ভেরিভেটিভ ট্রেডিং-এর মাধ্যমেই নাকি পুঁজি বেড়ে চলেছে আর তাই মুনাফা অর্জনের জন্য মানবশ্রম আজ আর প্রয়োজন নেই। সুতরাং এই ডেরিভেটিভ-এর মাধ্যমে পুঁজি কীভাবে বেড়ে ওঠে ৬ গুণ বা ১০ গুণ[৭], এবার সেটা আমরা দেখব।

কোন একটি উৎপাদনক্ষেত্রে, কাল্পনিক উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, একটি প্যারাসিটামল ওষুধের কোম্পানীর হাতে আগামী বছরের মে-জুন মাসে থাকবে ১০০ কোটি টাকার ওষুধ, যার মধ্যে প্রফিট প্রায় ২০ কোটি টাকা (অর্থাৎ বিনিয়োগ দাম ৮০ কোটি), কিন্তু এক্সপায়ারি ডেট জুলাই। দেখা যাচ্ছে প্রতিবছর ঐ সময়টায় ডেঙ্গু হচ্ছে ব্যাপকভাবে। কিন্তু এ বছর থেকে বিভিন্ন পৌরসভা নানা প্রচার-অভিযান চালিয়ে মশার প্রকোপ কমানোর বন্দোবস্ত করছে, যার ফলে একটা সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে ওষুধের কোম্পানীর ৩০ কোটি টাকার ওষুধ কম বিক্রি হওয়ার। এরকম অবস্থায় তার সাথে চুক্তি হতে পারে কোন ফাটকা কারবারীর (স্পেকুলেটর 'ক'-এর), যে হয়তো লক্ষ করছে এই প্রচার-অভিযানে আদৌ সমস্যার সমাধান হবে না এবং ফলত অমন লস্‌ও হবে না; ধরা যাক, চুক্তি অনুযায়ী এপ্রিল মাসে এই ১০০ কোটি টাকার ওষুধের মালিকানাস্বত্ব কিনে নেবে স্পেকুলেটর 'ক' ৯০ কোটি টাকায়। এখন ৩০ কোটি টাকার ওষুধ বিক্রি না হলে কোম্পানী লস্ করত ১০ কোটি টাকা, কিন্তু সেক্ষেত্রে তারা এখন লাভ করছে ১০ কোটি টাকা। ২০ কোটির বদলে লাভ করছে কেবল ঐ ১০ কোটি টাকাই, কিন্তু ১০ কোটি টাকা লসের রিস্ক সে বেচে দিয়েছে। স্পেকুলেটর 'ক' লস্ করবে ২০ কোটি টাকা যদি ৩০ কোটি টাকার ওষুধ বিক্রি না হয়, আর সে লাভ করবে ১০ কোটি টাকা যদি সম্পূর্ণ বিক্রি হয়ে যায়। এধরনের হাত বদলে পুঁজি বাড়বার বা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের কোন সম্ভাবনাই নেই। সর্বাধিক যা হতে পারে, তা হল, আরও রিস্কি চ্যুক্তির ক্ষেত্রে, একজন হয়ে উঠবে বড় অঙ্কের অর্থের মালিক আর অন্য জন দেউলিয়া।

স্পেকুলেটর 'ক' এই 'কনট্র্যাক্ট' অন্য একজন স্পেকুলেটর 'খ'-কে বেচে দিতে পারে ৫ কোটি টাকায় যদি অন্য কোন সেক্টরে টাকা খাটিয়ে আরও লাভের সন্ধান পায়। এর মধ্যে দিয়ে স্পেকুলেটর 'ক' হারাবে ১০ কোটি টাকা লাভের সম্ভাবনা, কিন্তু একইসাথে সে মুক্তি পাবে ২০ কোটি টাকা লসের সম্ভাবনা থেকেও। উপরন্তু কোন খরচ না করেই সে অর্জন করছে ৫ কোটি টাকা। 'খ' এই ৫ কোটি টাকার বিনিময়ে পেয়েছে ১০ কোটি টাকা লাভের (নেট ৫ কোটি টাকা) সম্ভাবনা ঐ কনট্র্যাক্টের মালিক হয়ে, যদিও তার সাথে উল্টোদিকে আছে ২০ কোটি টাকা লসের রিস্কও। এখন 'খ' এই ৫ কোটি টাকাটা, ধরা যাক, ধার নিয়েছে একটা ব্যাঙ্ক 'ব'-এর থেকে। অন্যদিকে স্পেকুলেটর 'ক' ঐ প্রাপ্ত ৫ কোটি টাকা ধার দিয়েছে আর এক স্পেকুলেটর 'ঘ'-কে যে সেই টাকা দিয়ে ঐরকমই কোন একটা কনট্র্যাক্ট কিনেছে 'গ'-এর থেকে। বিষয়টা ছক কেটে দেখালে দাঁড়াবে এইরকম:

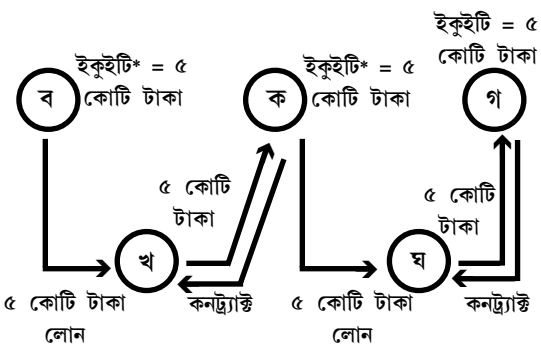

* 'ব' ও 'ক'-এর ইকুইটি আসলে (-৫) কোটি টাকা লাইয়াবিলিটি (অর্থাৎ প্রাপ্য ৫ কোটি টাকা)-র সমান

এখন 'খ' ও 'ঘ'-এর ৫ কোটি টাকা করে লাইয়াবিলিটি (অর্থাৎ পরিশোধযোগ্য লোন) আছে#, আর আছে ৫ কোটি টাকা দিয়ে কেনা 'বন্ড পেপারস্', যার জন্য 'খ' একটা নির্দিষ্ট সময় পর (চুক্তির মেয়াদ অনুযায়ী মে-জুন মাসে) লাভ করতে পারে ১০ কোটি টাকা বা তার হতে পারে ২০ কোটি টাকা লস (এবং 'ঘ'-ও ঐরকমই কিছু একটা)। অথবা তারা ঐ কনট্র্যাক্টগুলোকে আবার বেচে দিতে পারে অন্য স্পেকুলেটরদের কাছে। যাই হোক, যেহেতু এই কনট্র্যাক্টগুলোও এখন আত্মপ্রকাশ করে 'পণ্য' হিসাবে এবং 'বন্ড পেপারস্'গুলো হয়ে দাঁড়ায় বিনিময়ের মাধ্যম (অর্থাৎ টাকার সাবস্টিটিউট), তাই ঐ কনট্র্যাক্টগুলোর বাজার-দামে কেনা-বেচা চলে, আর সেক্ষেত্রে 'খ' এবং 'ঘ'-এর ইকুইটি হয়ে দাঁড়ায় শূন্য (৫ কোটি টাকার কনট্র্যাক্ট আর ৫ কোটি টাকা লাইয়াবিলিটি)। কিন্তু 'ব', 'ক' ও 'গ'-এর প্রত্যেকের ইকুইটি এখন এই প্রক্রিয়ার মধ্যে ৫ কোটি টাকা করে ('ব' ও 'ক'-এর ক্ষেত্রে তা প্রাপ্য আর 'গ'-এর তা হাতেই এসে পৌঁছেছে)। এই কেনা-বেচা শুরুর আগে 'ব'-এর ছিল ৫ কোটি টাকা (যা সে লোন দিয়েছে 'খ'-কে) আর 'ক' ও 'গ'-এর কাছে ছিল দুটি কনট্র্যাক্ট মাত্র, একটা নির্দিষ্ট সময় পরে লাভ বা লোকসান দুই-ই হতে পারে যার ফল; আর সেই সম্ভাবনাও এখন ঢুকে পড়েছে বাণিজ্যের আওতায়, আর এই কনট্র্যাক্টকে বানিয়ে তুলেছে একটা পণ্য। আসলে এই প্রক্রিয়ায় (ছকটা আর একবার দেখুন) ৫ কোটি টাকা 'ব' থেকে 'খ', 'ক', 'ঘ' হয়ে পৌঁছেছে 'গ'-এর হাতে, কিন্তু তাকে বাড়িয়ে তুলেছে ১৫ কোটি টাকায় ('ব', 'ক' 'গ'-এর মোট ইকুইটি), অর্থাৎ ৩ গুণ। আর এভাবেই আরও আরও ডেরিভেটিভ ট্রেডিং-এর মধ্যে দিয়ে তা হয়ে উঠতে পারে ৬ গুণ বা ১০ গুণ।[৮]

কিন্তু যেটা দেখার বিষয়, তা হল এই যে, ঐ ১০০ কোটি টাকার প্যারাসিটামল ওষুধ উৎপাদন এবং বিক্রি হলে (এবং 'ঘ'-এর কনট্র্যাক্ট-এর উৎপাদনক্ষেত্রেও উৎপাদন ও বিক্রি আশাজনক হলে), অর্থাৎ 'খ' ও 'ঘ' চুক্তির টাকা পেলে, আর ফলত তারা লোন শোধ করে দিলেই 'ব' ও 'ক'-এর লাইয়াবিলিটি মিটে গিয়ে ইকুইটি হয় শূন্য, আর ১৫ কোটির পুঁজি আবার পরিণত হয় ৫ কোটিতেই (যা 'গ'-এর হাতে আছে)। অর্থাৎ প্রকৃত পুঁজির ৩ গুণ, ৬ গুণ বা ১০ গুণ যতোই হোক ডেরিভেটিভ পুঁজির পরিমাণ, সব শোধ হয়ে গেলেই তা চুপসে যাবে আসল অঙ্কে, আর চুক্তি অনুযায়ী দিনক্ষণের মধ্যে শোধ না হলেই ফেটে যাবে বুদ্‌বুদের মতো (এক্ষেত্রে অবশ্য চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়ে কিছুটা সামলানোর চেষ্টা হয়)। কিন্তু মোদ্দা কথা এইটাই যে, ৫ কোটি টাকাকে ১৫ কোটি টাকায় পরিণত হওয়ার জন্যও যেতে হয়েছে দু-দুটো কনট্র্যাক্টের মধ্যে দিয়ে; এবং এভাবেই যতো যতো পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে হবে পুঁজিকে, যেতে হবে ততো ততো দামের কনট্র্যাক্রের মধ্য দিয়ে, দরকার হবে উৎপাদনের ততো পরিমাণ দামের

৫. থমাস পিকেটি তাঁর 'একুশ শতকে পুঁজিবাদ' বইতে ইউরোপের প্রধান তিনটি দেশ—জার্মানি, ব্রিটেন ও ফ্রান্স এবং মার্কিন দেশের পুঁজির যে লেখচিত্র দেখিয়েছেন,তাতে স্পষ্ট যে তাদের জাতীয় আয়ের তুলনায় বিদেশে পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই অত্যন্ত কম, প্রায় ৫%।

৬. এঙ্গেলসের 'ইংলন্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' এবং লেনিনের 'সাম্রাজ্যবাদ' বইতে এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৭. ২০০৮ সালে যখন বিশ্বে আর্থিক মন্দা দেখা দেয়, তখন ডেরিভেটিভ ক্যাপিটাল ছিল ৬৮০ ট্রিলিয়ন ডলার, যেখানে সমগ্র বিশ্ব উৎপাদন ছিল মাত্র ৬৫ ট্রিলিয়ন ডলার এবং মোট শেয়ার ১০০ ট্রিলিয়ন ডলার।

\# হিসাবটা সহজে বোঝানোর জন্য আমরা লোনের উপর সুদটা ধরিনি, যদিও সেটাও পুঁজিকে আরও বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু এতে ঘটনাটার গুণগত পার্থক্য খুব একটা হয় না, কারণ সুদ মুনাফারই অংশবিশেষ।

৮. ২০০৭ সালে বিশ্বজুড়ে কোম্পানীগুলোর হাত বদলের মোট দাম ছিল ৫১.২ ট্রিলিয়ন ডলার, ২০০৮-এ তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৫৭.৫ ট্রিলিয়ন এবং ২০১১-এ তা হয় ৫১.৬ ট্রিলিয়ন, যে বছর মোট বিনিয়োগ ছিল মাত্র ১৫৯.৮ বিলিয়ন ডলার।

ডেরিভেটিভগুলোর, এবং এর ফলে তাকিয়ে থাকতে হবে সেই সেই উৎপাদন তথা উৎপাদন দামের দিকে। ঐ ঐ উৎপাদন ক্ষেত্রে ঐ ঐ পরিমাণ বিনিয়োগ হলেই, আর গোটা সমাজ জুড়ে মানুষের শ্রমে পণ্য উৎপাদিত হলেই, ততো পরিমাণ শ্রমদিবসের সমতুল্য দামের থেকে আনুপাতিক মুনাফা যোগ হবে বিনিয়োগ দামের ওপর এবং যা পণ্যের আকারে বাস্তব সমাজে বিক্রি হয়ে সে অর্থ পুঁজিপতির কাছে ফিরে এলেই, কেবল তবেই, লাইয়াবিলিটিগুলো কাটাকাটি হয়ে ডেরিভেটিভের আবরণ ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে আসল ক্যাপিটাল; না হলেই ক্রাইসিস। সুতরাং যদিও আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃত ক্যাপিটালের কয়েকগুণ বেশি ডেরিভেটভ ক্যাপিটালকে এক ফিন্যান্স কারবারীর কাছে অন্য ফিন্যান্স কারবারীর, এবং ফিন্যান্স কারবারীর কাছে বিনিয়োগকারী পুঁজিপতির 'দেনা' বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবত তা হল 'মানবশ্রম'-এর কাছে পুঁজির দেনা। পরাজয়বাদীর কাছে তাই এ ঘটনা প্রতিভাত হয়ে বাস্তবের উপর কল্পনার প্রভুত্ব হিসাবে, পোস্ট-মর্ডানিস্টের কাছে তা দেখা দেয় 'কার্য-কারণ, এর উপর 'সম্ভাবনা'-র ব্যাপ্তি হিসাবে, কিন্তু মার্কসবাদীদের কাছে তার স্পষ্ট প্রকাশ হয় 'শ্রেণীদ্বন্দ্ব' রূপে। সুতরাং ডেরিভেটিভ ট্রেডিং-এর মাধ্যমে পুঁজির ৬ গুণ বা ১০ গুণ বেড়ে ওঠা আদতে কনট্র্যাক্টগুলোর মেয়াদের মধ্যে ঐ পরিমাণ উৎপাদন দাম সৃষ্টি ও তার বাস্তব বাণিজ্যের বাধ্য বাধকতাকেই প্রকাশ করে; অর্থাৎ তা দেখায় এই দামের মধ্যে মুনাফার পরিমাণটা যতোটা, তা যতো পরিমাণ উদ্বৃত্ত শ্রমের (বিনিয়োগ অনুযায়ী) আনুপাতিক হারের সমান, গোটা সমাজে ততো পরিমাণ মোট উদ্বৃত্ত শ্রম ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশ্য প্রয়োজন। সুতরাং এই সময়কালে সেই অনুযায়ী মোট শ্রমদিবস সৃষ্টি করা মুনাফাখোরদের জন্য অপরিহার্য। ভাবুন, এমতাবস্থায় সমাজের যে কোন অংশে শ্রমিক ধর্মঘট ভাঙতে এই মুনাফাখোর মালিকশ্রেণীর ও তার প্রচারকদের মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আর কোনো উপায় আছে কি!

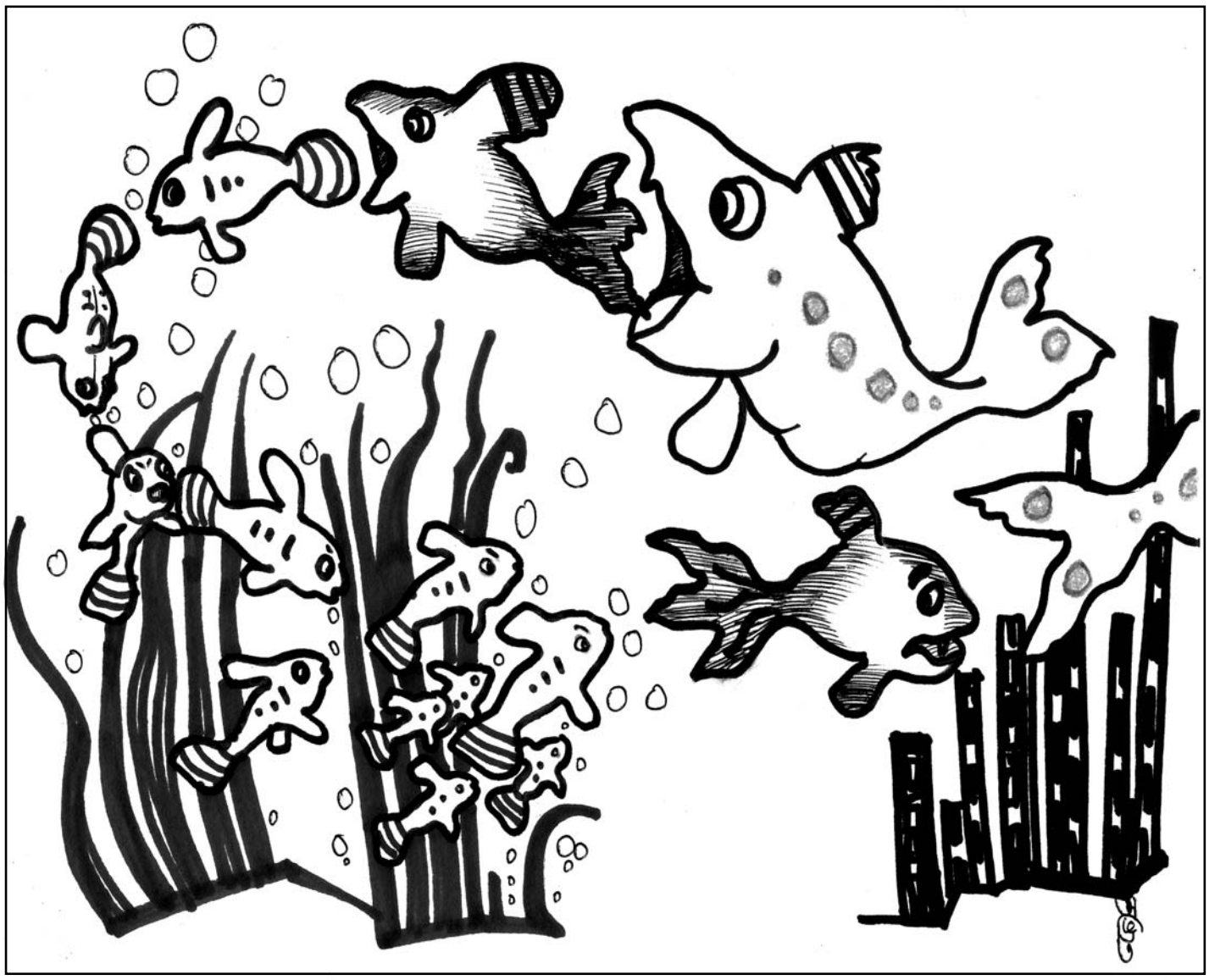

।। একটি সামগ্রিক আলোচনা।।

একটা পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থায়, অর্থাৎ একই পুঁজির চলাচলের সীমানাক্ষেত্রের মধ্যে, মোট উৎপাদন দাম হল মোট বিনিয়োগ যোগ পণ্য উৎপাদনে ব্যয়িত মোট দাম না পাওয়া মানবশ্রম (তথা শ্রমদিবসের)-এর দামের সমান। এই দ্বিতীয় অংশটা অর্থাৎ মোট সামাজিক শ্রমের উদ্বৃত্ত অংশটায় ভাগ থাকে, প্রথমত বিনিয়োগকারীর মুনাফার, দ্বিতীয়ত ফিন্যান্স কারবারীর সুদের, তৃতীয়ত উৎপাদিত বা পুনরুৎপাদিত নয় উৎপাদনের এমন সব উপায়ের মালিকদের এবং শেষ পর্যন্ত এ ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা ধরে রাখার জন্য প্রশাসনিক-সামরিক-পরিষেবামূলক খরচাপাতির জন্য ট্যাক্স হিসাবে রাষ্ট্রের। শ্রমিকের দাম না পাওয়া শ্রমের এই ভাগবাঁটোয়ারা হয় গড়পরতা মুনাফার হার আর সুদের হার অনুযায়ী# মোটের উপর এই ধারনার ভিত্তিতে, 'যার যতো বিনিয়োগ, তার ততো লাভ'। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল দুটি, এক, মোট যে উৎপাদন-দাম সৃষ্টি হয়, সমস্তটা বিক্রির মাধ্যমে উপলব্ধ হয় না, এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা এই উপলব্ধ মুনাফা হার-এর তথ্য দিয়ে বিচার করেন ধরে নেওয়া গড়পরতা মুনফা হারের তত্ত্বকে আর স্বাভাবিকভাবেই না মেলাতে পেরে হতচকিত হয়ে যান, ঠিক তেমনই যেমন পুঁজিপতিরা বাস্তব বিক্রি আর উৎপাদনের পরিমাণের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে না পেরে;[৯] আর দুই, দাম নির্ধারণের এ ধরনের পদ্ধতি কোন ধ্রুবসত্য নয়, চিরকাল তা এরকম ছিলও না, প্রকৃতপক্ষে মানবসভ্যতার প্রথম যুগে বিনিময় প্রথাই ছিল না ফলত দামের প্রশ্নও ছিল না এবং আজকের দামের এই নিয়ম নিজেই উৎপাদন ব্যবস্থা আর সেই অনুযায়ী বিনিময় প্রথার দীর্ঘ বিকাশ ধারার ফল;[১০] এবং শোষণমুক্ত পর্যাপ্ত উৎপাদনশীল সমাজে স্বাভাবিকভাবে বিনিময়প্রথা ও দাম সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে যাবে এবং ফলে তার অস্তিত্বও।

যেহেতু পুঁজির চলাচলের ক্ষেত্রের মধ্যে সমগ্র মানবশ্রমের উদ্বৃত্ত দাম ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যায় ঐ চারভাগে এবং তা মূলতঃ বিনিয়োগের আনুপাতিক হারে পুঁজিপতিদের ও ফিন্যান্স কারবারীদের মধ্যে গড়-পরতা মুনাফার হার ও সুদের হার অনুযায়ী, সেজন্যই দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে পথ চলা কেন্দ্রীভূত ও বিশ্বায়িত পুঁজির আওতায় তা ধারণ করে নতুন একটা দশা। বিপুল মুনাফা অর্জনকারী কেন্দ্রীভূত পুঁজির সাথে তার বশ্যতা স্বীকারকারী পুঁজিসমূহ এবং তার চারপাশে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ও নিঃস্ব হতে থাকা প্রতিযোগিতার পেতি ও ক্ষুদ্র উৎপাদন; আর সেই অনুযায়ী মুষ্টিমেয় বিপুল ধনীর পক্ষে দাঁড়ানো মোটামুটি ভাল অবস্থায় থাকা মধ্যশ্রেণী এবং সর্বহারার পাশে ভিড় করা অসংখ্য গরীব শ্রমজীবী মানুষ। ভাগাভাগি ও সম্পর্কের এ দৃশ্যটা যেমন স্পষ্ট গোটা বিশ্বের দিকে তাকালে দেশগুলোর পলিটিকাল স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপের ক্ষেত্রে, তেমনই কোন দেশের মধ্যে মেট্রো শহর, মফস্বল আর গ্রামগুলোর চেহারায়, আর ঠিক তেমনই শহরগুলোর আকাশছোঁয়া বাড়িগুলোর চারপাশে বসবাসের অযোগ্য বস্তিগুলোর দৃশ্যে, এমনকি, বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়-স্বজন-পরিবারবর্গের স্ট্যাটাস অনুযায়ী মেলামেশা চলাফেরার বেলাতেও; যেন একটা গাছের ডালগুলো যেভাবে ভাগ হয়েছে, পাতাগুলোও সেভাবে, আর এমনকি পাতার শিরা-উপশিরাগুলোও, গণিতের ভাষায় যাকে বলে 'ফ্রাক্টাল'। সমাজের যে কোন ক্ষুদ্র অংশেই গোটা সমাজটাকে যেন দেখা যায়,—পুঁজি তার নিজের সাথে তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কি বিপুল সামাজিকীকরণ করেছে তা স্পষ্ট হতে থাকে প্রতিদিন। পুঁজির কেন্দ্রীভবনের সাথে সাথে চলতে থাকে ক্রয়ক্ষমতারও কেন্দ্রীভবন, যা একটা প্রবণতা তৈরী করে কমসংখ্যক বেশি দামী ক্ষণস্থায়ী পণ্যের বারংবার উৎপাদন, নতুনরূপে নতুন গুণে সমৃদ্ধ।[১১]

মনে রাখা দরকার, এই গড়পরতা হার মানে নির্দিষ্ট একটা সংখ্যা নয় যে ভুলটা অর্থনীতিবিদেরা প্রায়শই করে থাকেন; এর মানে এই গড়-এর উপর-নীচে একটা বিন্যাস থাকে, সাধারনত যার প্রবণতা থাকে, স্ট্যাটিস্টিক্স্-এর ভাষায় যাকে বলে 'নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন', তার দিকে। দাম নির্ধারণের সময় ধরে নেওয়া এই গড় মুনফা হার হল বাস্তবে উপলব্ধ মুনাফার হারের বিন্যাসের গড়, অর্থাৎ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধরে নেওয়া একটা গড়।

৯. উদাহরণস্বরূপ, একটা পুঁজিবাদী দেশের অসাম্য-এর অবস্থাকে পিকেটি তাঁর 'একুশ শতকে পুঁজিবাদ' বইটিতে বিচার করেন এই উপলব্ধ মোট মুনাফা হারের সাথে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারকে তুলনা করে। প্রথমতঃ, মোট 'উপলব্ধ' মুনাফা (যার মধ্যে ধরা হয়েছে উপরে বলা চারটে অংশই) হারকে মার্ক্সের পদ্ধতিতেই তিনি গণনা করেন এবং তার সাপেক্ষে ভুল বলে ঘোষণা করেন 'নির্ধারিত' মুনাফা হারের তত্ত্বকে। দ্বিতীয়তঃ জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার যে উৎপাদনশীলতা ও জনসংখ্যা (আসলে হবে পণ্য উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা) বৃদ্ধির হারের উপরই নির্ভরশীল, তা উল্লেখের মধ্যে দিয়ে তিনি কার্যতঃ স্বীকার করে নেন মার্ক্সেরই কেবল শ্রম দ্বারা মূল্য সৃষ্টির তত্ত্বকেই, যদিও শ'খানেকবার মার্ক্স-এর তত্ত্বকে খারিজ করেন তাঁর গবেষণার ভিত্তি হিসাবে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে শ্রম ও পুঁজির অন্য দেশে চালান-এর বিষয়টাকে পৃথকভাবে গণনা না করে একটা বিজ্ঞান সম্মত তত্ত্ব খাড়া করতে অসমর্থ হন, বিশেষ করে একুশ শতকে, যখন এটাই পুঁজিবাদের প্রধান বিষয়।

১০. মার্কসের 'ক্যাপিটাল'-৩য় খণ্ডে এঙ্গেলসের 'মূল্যের নিয়ম' সংক্রান্ত সংযোজনী দেখুন।

১১. উদাহরণ স্বরূপ, টয়োটা যা আজকে বৃহত্তম গাড়ি কোম্পানি, ১৯৩৬ সালে যখন প্রথম গাড়ি বাজারে নিয়ে আসে, তা ছিল ফোর্ড বা জেনেরাল মোটরস-এর গাড়ির থেকে প্রায় ১০% সস্তা (দশভাগের একভাগ দাম); ১৯৮০-র দশকের শেষে সে-ই লঞ্চ করে লাক্সারী গাড়ির একটি আলাদা শাখা 'লেক্সাস'। ৭০-এর দশকেও যার অ্যাডভার্টাইসমেন্টের স্লোগান ছিল ''চাইলেই পাবে'', ২০০০-সালে তার স্লোগান দাঁড়ায় ''অনুভূতির আস্বাদ নাও।'' এভাবেই পরিমাণ থেকে উৎপাদনের গুণগত ধরনে রূপান্তর স্পষ্ট হয় যখন দেখা যায় এই কোম্পানি গত শতাব্দীর শেষ পঞ্চাশ বছরে তৈরী করেছে যেখানে মাত্র ১৬টি ব্রান্ড, সেই এই শতকের প্রথম দশ বছরে এনেছে ৪৪টি ব্রান্ড; এবং যার ক্ষণস্থায়িত্ব প্রমাণ পায় যখন দেখি এই দশ বছরেই তাকে দিতে হয়েছে ১৬টি 'রিকল'।

এর ফলে পুঁজিবাদ, তার অতিরিক্ত উৎপাদনের ব্যাধিও, 'স্থান'-এর সীমানা পেরিয়ে এগিয়ে চলে 'কাল'-এর যাত্রায়। এখন, একই সাথে প্রচুর কমদামী পণ্যের উৎপাদন, তবুও যা কেনার জন্য একই সময়ে ততো মানুষের হাতে টাকার যোগান নেই, পুঁজিবাদের এই অবস্থাটা রূপান্তরিত হয়েছে, যখন বেশি দামী পণ্যের বারবার উৎপাদন যা এই দামী ক্রেতাদের হাতে সেই পরিমাণ টাকার ভবিষ্যৎ জোগানের দাবী রাখে; এবং ফলে একই সময়ে প্রচুর পণ্য উৎপাদনের বদলে ভবিষ্যতের সময়কাল জুড়ে প্রচুর উৎপাদনের চুক্তির প্রবণতা সৃষ্টি করে। ফলে অসংখ্য গরীব মানুষের কিছুটা ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির কেন্সীয় তত্ত্ব বর্তমান বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ আদৌ নয়, বরং দামী পণ্যের একটা ক্রেতা শ্রেণী—একটা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আপাত স্বার্থ রক্ষাই নয়া উদারবাদী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। 'অস্টারিটি' বা 'কৃচ্ছসাধন' তাই কোন পলিসি নয়, বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও বুর্জোয়া সরকারের বাধ্যবাধকতা, অর্থাৎ পুঁজিবাদের বর্তমান দশার বৈশিষ্ট্য। একে 'রাষ্ট্রের পিছু হঠা' বলে আখ্যা দেওয়ার অর্থ তথাকথিত 'কল্যাণকামী' রাষ্ট্রকে বুর্জোয়া শোষণের যন্ত্র বলে স্বীকার না করা, তার মোহে পড়ে থাকা, বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্রকেই মানুষের গণতন্ত্র বলে প্রচার করা, অথচ যা আসলে পুঁজির তৎকালীন দায়িত্বই পালন করছিল নিষ্ঠাভরে। প্রকৃতপক্ষে এ হল বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিকাশ—'কল্যাণকামী' থেকে 'নয়া উদারবাদী'-তে রূপান্তর আসলে পুঁজির অতিরিক্ত উৎপাদনের ধরন 'পরিমাণ' থেকে 'গুণ'-এ (স্ট্যাটিস্টিক্স-এর ভাষায় 'অ্যানসেম্বেল' থেকে 'টাইম ভ্যারিয়েশন'-এ) উত্তরণের রাজনৈতিক রূপ। বিপরীতে 'কল্যাণকামী' দাবিসমূহ উত্থাপন করাই আজ পিছু হঠার সামিল। 'পরিমাণ' থেকে এই 'গুণ'-এ উত্তরণ অবশ্য বিপুল পরিমাণের উৎপাদনকে নাকচ করে হয় না, বরং তাকে চারপাশে রেখেই একটা কেন্দ্রীয় প্রবণতা অনুযায়ী চলে, যেমনভাবে প্রতিযোগিতাকে চারপাশে জিইয়ে রেখেই কেন্দ্রীভূত পুঁজি নিজের গতি নেয়। এখন এই ভবিষ্যৎ উৎপাদনের চুক্তিসমূহ বর্তমানের বিপুল শ্রম (তথা শ্রমদাম সৃষ্টি)-কে নাকচ করে নয় বরং তারই সাপেক্ষে ভবিষ্যতের শ্রমশোষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। ডেরিভেটিভ ক্যাপিটাল-এর বুদবুদ কেবল তা-ই প্রকাশ করে। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-তে মার্কস্ বলেছিলেন, ''বুর্জোয়া সমাজে বর্তমানের উপর আধিপত্য করে অতীত।'' আজকে তার বিকাশের স্তর পৌঁছেছে সেই মাত্রায়, যখন **শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যতের ওপরেও আধিপত্য করছে অতীত।**

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রমের আজকের কর্তব্য তাই অতীতে ফিরে যাওয়ার দাবী তোলা নয়, ভবিষ্যতের দখল নেওয়ার। সুতরাং পুঁজির ভবিষ্যতের লক্ষ্যমাত্রার বিরুদ্ধে সংঘাত সৃষ্টিই যে তার একমাত্র কর্তব্য, তা বলাই বাহুল্য। চুক্তিমাফিক ভবিষ্যতে যতো শ্রমদাম-এর উদ্বৃত্ত তাদের অর্জন করতে হবে (কনট্র্যাক্টগুলোর মেয়াদ আর ডেরিভেটিভের দামসমূহ থেকে যা অনায়াসে স্পষ্ট হয়), আঘাত হানতে হবে তার ওপরেই। সুতরাং এ আঘাত হানতে হবে তাঁদেরই, যাঁরা তৈরী করছেন এই উদ্বৃত্ত, —প্রথমতঃ মজদুর শ্রেণী, সংগঠিত হোন বা অসংগঠিত, কেবল নিজের খাটবার ক্ষমতাকেই যাঁরা বেচেন সামান্যতম মজুরির বিনিময়ে, এবং দ্বিতীয়তঃ গরীব কৃষক ও স্বনিযুক্ত শ্রমিক, নিজের তৈরী করা পণ্য বেচেও খাটুনির দাম যাঁরা তুলতে পারেন না। এ বিষয়ে মধ্যশ্রেণীগুলো (শিক্ষক-অধ্যাপক-ডাক্তার, মোটা মাইনের অফিসকর্মী, আজ যাঁরা উচ্চ মধ্যবিত্ত) এবং উদ্বৃত্তভোগী তথাকথিত 'দক্ষ' শ্রমিকদের দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে, এবং তাঁরাই দলে দলে বেরিয়ে এসে শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠিত করবেন, এধরনের আশা পোষণ করে কেবল সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিকে ও তার তীব্র শোষণের ব্যবস্থাকে সহায়তাই করা যেতে পারে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়। এঁদের মাঝে 'অবতার' খোঁজার পেছনে সময় ব্যয় করা আজ কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে শুধু বাহুল্যই নয়, ক্ষতিকর। প্রবল বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামের জোয়ারে নিজে থেকেই যে 'অবতার'-রা আসবেন, যেমন এসেছেন বারংবার সমস্ত দেশেই, কিন্তু কেবল 'ওম্যাটোকায়া' জনগণের লড়াইয়েরই অংশ হতে, 'ওম্যাটোকায়া'-দেরই একজন হতে, নিজের শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার্থে নয়, তাঁদের সাদর আমন্ত্রণ জানাতে আমরা দ্বিধাবোধ করি না। শুধু ''নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের আওতায় শ্রেণী সম্পর্কের পরিবর্তন হয়েছে'', একথা বলার পাশাপাশি ঠিক কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে এবং বর্তমান উদ্বৃত্ত অর্জন তথা শ্রেণীশোষণের স্বরূপ ঠিক কী, তা সবিনয়ে চেপে যান যে সমস্ত কমিউনিস্ট নেতা ও তাত্ত্বিকেরা, তার বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে আমরা খোলসা করে দিই শ্রেণীসম্পর্কের পরিবর্তনের এই রূপকে। একশ বছর আগে লেনিন যাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন উন্নত দেশগুলোর 'ঘুষ খাওয়া' শ্রমিক বলে, তা-ই আজ এক-একটা দেশের গন্ডির মধ্যেও 'দক্ষ' ও ম্যানেজারিয়াল শ্রমিকদের ভূমিকায় পরিলক্ষিত হয়। একশ বছরে সাম্রাজ্যবাদ বিকশিত হয়েছে এভাবেই যে, লেনিন যা ব্যাখ্যা করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী জাতি সমূহ ও অন্যান্য জাতিগুলির অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আজ তা-ই দেখা দিয়েছে এক-একটা জাতিরাষ্ট্রের নিজের অভ্যন্তরেও, পুঁজি যখন জাতিরাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করেছে। শুধু সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতেই নয় এক-একটা জাতিরাষ্ট্রের মধ্যেও আজ পুঁজির একচেটিয়াগুলোর সংঘাত ক্রমবর্ধমান, যা প্রকাশ পায় তাদের প্রোডাক্ট কোয়ালিটি আর অ্যাডভার্টাইজমেন্টকে কেন্দ্র করে পরস্পরের বিরুদ্ধে কেস-কাবারির বাড়-বাড়ন্ত থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির কেনা-বেচা সংক্রান্ত দুর্নীতি ও নেতা-মন্ত্রীদের জেল-হাজতের রমরমা বৃদ্ধির দৃশ্যগুলোতে। ভেতরে ক্যাসার আর বাইরে বিশাল চেহারার পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ নামক এই বিশাল রাক্ষসটার প্রাণভোমরা কিন্তু মজদুর এবং কৃষক ও স্বনিযুক্ত শ্রমিক, যাঁরা বাধ্য হন তাঁদের যথাক্রমে শ্রমশক্তি ও উৎপাদিত পণ্য বেচতে, আপাতদৃষ্টিতে দুর্বল, তাঁদেরই হাতে; তাঁদের এই শ্রমশক্তি ও উৎপাদিত পণ্য বেচবার সম্মতির বিচারে। আজকের পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেক্ষিতে বিপ্লবী আঘাত হানার উপায়ও তাই—লেনিনীয় দৃষ্টিতে, ''আঘাত কর সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতম গ্রন্থিতে।''

''আপন মতামত ও লক্ষ্য গোপন রাখতে কমিউনিস্টরা ঘৃণা বোধ করে। খোলাখুলি তারা ঘোষণা করে যে, তাদের অভীষ্ট অর্জিত হতে পারে কেবল সমস্ত বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার সবল উচ্ছেদ ঘটিয়েই। কমিউনিস্ট বিপ্লবের আতঙ্কে শাসক শ্রেণিরা কাঁপুক। শৃঙ্খল ছাড়া প্রলেতারিয়েতের হারাবার কিছু নেই। জয় করবার জন্য আছে সারা জগৎ।''

।। দুনিয়ার মজদুর এক হও।।

—কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্‌তেহার, কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেল্‌স্

জবর দখল

'জবর দখল' পত্রিকার গ্রাহক হন

সম্পাদকমণ্ডলী

অমর্ত্য রায়, সোহিনী সাহা, অরিজিৎ হালদার

যোগাযোগ : ১বি, সিমলাই পাড়া লেন, পাইক পাড়া, কলকাতা-৭০০০০২

ফোন : ৯৯৩২৫৯৬১৩০/৯৪৩২২২৬১৬০

Email : editor.jobordokhol@gmail.com

কামান দাগো

('স্ট্রাইক ব্যাক্'—কবিতার অনুবাদ)

গ্রেগ শটওয়েল

অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক, জেনেরাল মোটর্‌স্ অ্যান্ড ডেলফি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

কামান দাগো।
কামান দাগো, কাজহারা সব ভাই-বোন।
কামান দাগো, ঘৃণাভরা গর্জন।
কামান দাগো, তোমার মর্যাদা ফিরে পেতে।
কামান দাগো, 'সকলের চাই কাজ' এই দাবী রেখে।

কামান দাগো, অসাম্য হঠাও।
একঘেয়ে কাজ, বস্-এর আওয়াজ থামাও।
কামান দাগো, মুক্তির গান গাও।
ক্ষমতার এই ব্যালেন্সকে বদলাও।
মানুষ তুমি, জীবনের গান গাও।

কর্‌পোরেটের দমবন্ধ খোপ।
ত্বকের ওপর রক্তচোষা জোঁক।
কামান দাগো, গণতন্ত্র আরও.....
কামান দাগো, ওরা কথা শোনেনিকো কারো।
কামান দাগো, এবার উৎপাদনের উপায়টা আমারও।

কামান দাগো,
তোমার মায়ের রোগের অষুধ মেলেনা মেডিকেয়ারে।
জনতার নেতা অবসর ভাতা শুয়োর-খোঁয়াড়ে।
তোমার ইউনিয়কে ইনজাংক্শন রেহাই ম্যানেজমেন্ট।
বিচারপতির রায়ের গায়ে ইনডাস্ট্রির সেন্ট।

আজ ব্যবস্থাটায় আস্থা রাখা শক্ত ভারি
কামান দাগো, দেখাও ওদের কামান দাগতে পারি
কামান দাগো।

'জবরদখল'-এর পক্ষ থেকে অমর্ত্য রায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং গীতা প্রিন্টার্স ৫১এ ঝামাপুকুর লেন কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত